মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে ওআইসি (Organisation of Islamic Co-operation) এর ভূমিকা

[The Role of the OIC (Organisation of Islamic Co-operation) in the Development of Economy and Education in Muslim World]

GIFT

[এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১৫]

Dhak University Library
468271

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

গবেষক
মোঃ মাহবুবুর রহমান
রেজি নং- ২২২/২০১২-১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

468271

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

DIGITIZED

তারিখ: ০২ আগস্ট ২০১৫ইং

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **মোঃ মাহবুবুর রহমান** কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে ওআইসি (Organisation of Islamic Co-operation) এর ভূমিকা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত। আমার জানা মতে এটি একটি তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী কর্ম এবং ইতিপূর্বে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এ শিরোনামে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। আমি পান্ডুলিপিটি পড়েছি এবং এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপনের সুপারিশ করছি।

(ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

463271

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "**মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে ওআইসি (Organization of Islamic Co-operation) এর ভূমিকা**" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এই গবেষণার পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশ হয়নি কিংবা অন্য কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি।

০২.০৪.১৫

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
এম. ফিল গবেষক
রেজিং নং- ২২২/২০১২-১৩
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
ও
প্রভাষক (ইসলামী শিক্ষা বিভাগ)
নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ
লাকসাম, কুমিল্লা।

463271

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে আমার এ গবেষণাকর্মটি (মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে ওআইসি (Organization of Islamic Co-operation) এর ভূমিকা) সম্পন্ন করতে পেরে তাঁর দরবারে অশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন করছি এবং অসংখ্য দরূদ ও সালাম পেশ করছি তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজনে আবদ্ধ হয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান। কর্মব্যস্ততা ও শারীরিক অসুস্থ্যতা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা অভিসন্দর্ভটিকে মানসম্পন্ন করে তুলেছে। আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায়, উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাব সৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতায়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আমি তাঁর দীর্ঘায়ূ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আমার বিভাগের অন্যসব শিক্ষকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারণ তাঁরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে আমার গবেষণায় পরামর্শ দিয়েছেন এবং উদ্বুদ্ধ করেছেন।

পরম শ্রদ্ধা আর অসীম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা মরহুম মো: আবুল বাশারকে। আজ এমনই এক স্মরনীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহর দরবারে তার আত্মার শান্তি ও মুক্তি কামনা করছি। গভীর চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা খায়রুন নেছাকে। আমার গবেষণাকর্মে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দানে তার জুড়ি নেই। আমার জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় আমার মা তার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের একটা বড় অংশ ছাড় দিয়েছেন। মহান আল্লাহর দরবারে তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ূ কামনা করছি।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষকে, যাঁরা এম.ফিল কোর্স চালিয়ে যাবার অনুমতি প্রদান করে আমাকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পথ সুগম করে দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পিতৃতুল্য দুই ভাই মিজানুর রহমান ও এরশাদুর রহমান, ভাতিজা হামিম ও তামিম, ভাতিজি তাওসীফা এবং আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যবর্গের প্রতি। আল্লাহর দরবারে তাদের জীবনের সুখ-শান্তি-উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করছি।

আমার এই গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করার জন্য যে সকল বন্ধু বান্ধব, সহকর্মী, শ্রদ্ধাভাজন ও স্নেহাস্পদ এবং আপনজনেরা নানাভাবে আমাকে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং দুস্প্রাপ্য তথ্যাদি ও শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন তাদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

পরিশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা তিনি যেন এ প্রয়াস কবুল করেন।

এম. ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা।
ও
প্রভাষক (ইসলামী শিক্ষা বিভাগ)
নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ
লাকসাম, কুমিল্লা

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে ওআইসি (Organisation of Islamic Co-Operation) এর ভূমিকা

ভূমিকা: ১-৫

প্রথম অধ্যায় : ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা: নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা ৬-৫১

১ম পরিচ্ছেদ: ওআইসি প্রতিষ্ঠার পটভূমি

২য় পরিচ্ছেদ: ওআইসির প্রতিষ্ঠাকালীন পর্যায়

৩য় পরিচ্ছেদ: ওআইসির সদস্য দেশ

৪র্থ পরিচ্ছেদ: ওআইসির সাংগঠনিক কাঠামো

৫ম পরিচ্ছেদ: ওআইসির অঙ্গসংগঠন

দ্বিতীয় অধ্যায় : ওআইসি এর পুনর্গঠনের ইতিহাস ৫২-৬১

তৃতীয় অধ্যায় : সংস্কার কার্যক্রম ৬২-৭৮

চতুর্থ অধ্যায় : মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে ওআইসি এর ভূমিকা ৭৯-১২৮

১ম পরিচ্ছেদ: মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ওআইসি এর ভূমিকা

২য় পরিচ্ছেদ: মুসলিম বিশ্বে শিক্ষা বিস্তারে ওআইসি এর ভূমিকা

পঞ্চম অধ্যায় : একুশ শতকে ওআইসি এর সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা এবং এর কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে করণীয় । ১২৯-১৩৪

উপসংহার : ১৩৫-১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (Organisation of Islamic Co-operation) সংক্ষেপে ওআইসি মুসলিম দেশগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। সংস্থাটি সদস্য দেশসমূহের মধ্যে ইসলামি ঐক্য, সংহতি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন সাধন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা শক্তিশালীকরণ, মুসলিম দেশগুলোর বর্ণবাদ ও সকল ধরনের ঔপনিবেশিকতার মূলোৎপাটন করাসহ মুসলিম পবিত্র স্থানসমূহ শত্রুমুক্ত ও নিরাপদ করা, ফিলিস্তিনিদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি অব্যাহত সমর্থন দান এবং সদস্য দেশ ও অন্যান্য দেশের মধ্যে বৃহত্তর সহযোগিতা এবং সমঝোতার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে এর কার্যক্রম শুরু করে। এটি জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা।

নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সাধারণ মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিম উম্মাহর মাঝে যে ধারণা কাজ করে তার উদ্ভব ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই। আর এই উম্মাহর অংশ হিসেবে গর্বিত হওয়ার যে অনুভূতি মুসলিম জনমানসে বিদ্যমান তা ইসলামি চিন্তাধারায় একটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে। এই অনুভূতির কারণেই প্রায় তের শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহ খেলাফত কাঠামোর অধীনে মোটামুটিভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পেরেছে। উসমানীয় খেলাফত ছিল এই ধারার সর্বশেষ শাসনব্যবস্থা। ১৯২৪ সালে এই সর্বশেষ খেলাফত ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে। উসমানীয় খেলাফতকালীন সময়ে অন্যান্য মুসলিম শক্তি মুসলিম বিশ্বের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করলেও ঔপনিবেশিক শক্তির চরম বহি:প্রকাশ এবং বহুধাবিভক্ত মুসলিম বিশ্বের প্রেক্ষাপটে উসমানীয় খেলাফত মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব ও ঐক্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হত। কিন্তু উসমানীয় খেলাফতের বিলুপ্তির পর মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক কেন্দ্র বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। ধীরে ধীরে মুসলিম ভূখন্ড অমুসলিমরা দখল করতে শুরু করল, ইউরোপীয় শক্তির উত্থান ঘটল এবং মুসলমানদের পতন শুরু হল।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ একটি ইসলামি সংগঠন স্থাপনের লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। এ লক্ষ্যে মুসলিম চিন্তাবিদ, পন্ডিত, ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন প্রস্তাবনা ও উদ্যোগের মাধ্যমে ইসলামি সংহতির ধারণাটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এক্ষেত্রে উন্নয়নশীল মুসলিম দেশগুলো নিজস্ব সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনার্থে একটি সাধারণ মঞ্চ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বেশি উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ১৯২৪ সালের খেলাফত বিলুপ্তির পর ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এ লক্ষ্যে বেশ কিছু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সব কয়টি সম্মেলনেই ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা নেতৃবৃন্দের কাছে উচ্চারিত হলেও ঐক্যের একটা মজবুত ভিত রচিত হয়নি।

১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের নাজুক পরিস্থিতি মুসলিম উম্মাহকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। এর দু'বছর পর ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইসলামের তৃতীয় সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আল আকসা মসজিদ আক্রান্ত হলে মুসলিম উম্মাহর মাঝে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের প্রয়োজনীয়তাকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ২৫টি দেশের অংশগ্রহণে মরক্কোর রাবাতে গড়ে ওঠে ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (Organisation of Islamic Conference)। পরবর্তীতে ২০১১ সালে এর নতুন নামকরণ করা হয় ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (Organisation of Islamic Co-operation)।

প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালে সংস্থাটির প্রথম সনদ গৃহীত হয়। কিন্তু কালক্রমে সংস্থাটি এবং এর অঙ্গসংগঠনগুলোর কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এর সনদ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা গতি লাভ করে। ২০০৫ সালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একজন মহাসচিবের অধীনে ওআইসির সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয়। এ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ ছিল সময়ের দাবী অনুযায়ী একটি আধুনিক সনদ প্রণয়নের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী সনদের আমূল পরিবর্তন। ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশসমূহের পন্ডিত, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ২০০৮ সালে ওআইসির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী একটি সনদ প্রণয়ন করা হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিসংঘভুক্ত যেকোনো দেশ ওআইসির সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারে। এ জন্য সংস্থাটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের অনুমোদন প্রয়োজন। এছাড়া পর্যবেক্ষক দেশ কিংবা কোনো সংস্থা পর্যবেক্ষক হতে চাইলেও এ ধরনের অনুমোদন প্রয়োজন। প্রতি তিন বছর পর পর সংস্থাটির ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে মুসলিম উম্মাহর যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সুপারিশ কিংবা যেকোনো সদস্য দেশ বা মহাসচিবের উদ্যোগে বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

প্রতিষ্ঠার পর সংস্থাটির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত হয় "ইসলামি সংহতি" (Islamic Solidarity) ধারণা। কালক্রমে ওআইসি তার সদস্য দেশগুলোর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি সাধারণ অবকাঠামো হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলে। আর এক্ষেত্রে ওআইসির বিকাশ ঘটে অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর থেকে কিছুটা ভিন্ন মাত্রায়। কেননা ওআইসিভুক্ত সদস্য দেশগুলোর বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান,

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি এবং সামাজিক অবকাঠামোগত পার্থক্যের কারণে এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সদস্য দেশগুলোর এসব বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেই আজ সংস্থাটি একটি পরিপূর্ণ আন্ত:দেশীয় সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

৫৭ সদস্য বিশিষ্ট বিশ্বের এক-ষষ্ঠমাংশ ভৌগোলিক এলাকা ও এক-পঞ্চমাংশের চেয়েও বেশি জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্বকারী এ সংস্থাটি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিরোধ দূর করে একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদার করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এছাড়া সংস্থাটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, তথ্য-প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও শিক্ষা সম্প্রসারণমূলক নানাবিধ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় ১৯৬৭ সাল পূর্ববর্তী মানচিত্র অনুযায়ী জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধে সংস্থাটি উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং এ ব্যাপারে জাতিসংঘসহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ওআইসির গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা। এর সদস্য দেশগুলোর অধিকাংশই হচ্ছে শিল্প ক্ষেত্রে অনগ্রসর। এদের মাঝে ২২টি সদস্য দেশ স্বল্পোন্নত বা এলডিসির অন্তর্ভুক্ত। এসব দেশের সরকারগুলো তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সংস্থার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাই সংস্থাটি মুসলিম দেশগুলোর মধ্যকার সম্পর্কোন্নয়ন, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রতকরণ, সন্ত্রাসবাদ দমন ও নিরসন, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ, সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, আরব-ইসরাইল দ্বন্দ্ব নিরসন, আফগানিস্তান, বসনিয়া, চেচনিয়া, কাশ্মীরসহ সারা বিশ্বের মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, আন্ত:বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও ঘাটতি দূরীকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি মোকাবেলায় ত্রাণকার্য পরিচালনাসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পুনর্গঠনে কাজ করার পাশাপাশি আফ্রিকা ও এশিয়ার স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছে।

ওআইসির গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হচ্ছে শিক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে মানব সম্পদ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে সংস্থাটি বিভিন্ন দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক সহায়তা প্রদান, মুসলিম বিজ্ঞানীদের পুরস্কার প্রদান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং আইডিবির সহায়তায় সদস্য দেশগুলোর বিজ্ঞান ও তথ্য–প্রযুক্তি বিকাশে শিক্ষাবৃত্তি এবং তরুণ ও বেকার যুবকদের নানাবিধ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। এছাড়া মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ এবং সদস্য দেশগুলোর মাঝে সংস্কৃতির আদান-প্রদানসহ ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সঠিকভাবে জানার, বোঝার ও তুলে ধরার লক্ষ্যে সংস্থাটি দীর্ঘমেয়াদি এবং অভিনব সব কার্যক্রম এবং গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশসমূহের সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

সমাধানে নানাবিধ কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে মুসলিম ঐতিহ্যকে তুলে ধরা এবং মুসলিম উম্মাহকে সচেতন করার পাশাপাশি বিশ্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে গ্রন্থ রচনা, জার্নাল, প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ এবং সভা-সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে থাকে।

একুশ শতকে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুসলিম বিশ্বে আধুনিকীকরণ এবং মধ্যবর্তী ধারণার বিকাশ ঘটাতে ওআইসি কাজ করে যাচ্ছে। এই দুই নীতিকে মূল ভিত্তি ধরে আরও কিছু সংশ্লিষ্ট ধ্যান-ধারণার সমন্বয়ে ওআইসির দশসালা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ২০০৫ সালে পবিত্র মক্কা নগরীতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশেষ শীর্ষ সম্মেলনে এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার আওতায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নয়নের বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পায়। এছাড়া এই পরিকল্পনার আরেকটি প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বের মাঝে পারস্পরিক সমঝোতা ও সম্মানভিত্তিক একটি সম্পর্ক গড়ে তোলা। ৫৭টি সদস্য দেশের সমন্বয়ে গঠিত ওআইসি এখন একদিকে যেমন সদস্য দেশসমূহের অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করার জন্য একটি মোটামুটি সুবিধাজনক অবকাঠামো, অন্যদিকে এই ৫৭টি সদস্য দেশই ওআইসিকে বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় ও পরিপূরক সহযোগিতা প্রদানের জন্য যথেষ্ট।

সার্বিকভাবে ওআইসির ইতিহাস হচ্ছে উত্থান ও পতনের ইতিহাস, আবর্তন ও বিবর্তনের ইতিহাস এবং সাফল্য ও কঠোর সমস্যা মোকাবেলার ইতিহাস। তবে বিবর্তনের এই ধারায় ওআইসি সবসময়ই একটি আন্তঃদেশীয় সংস্থা হিসেবে নিজস্ব অবস্থানকে সুদৃঢ় রেখেছে। প্রতিটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিশেষ মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে এবং ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন ও অন্যান্য সাধারণ সম্মেলনে সদস্য দেশগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিলিত হয়েছে, ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ ও সংহতির ধারণাকে সমুন্নত রেখেছে এবং ওআইসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করেছে। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্ভাবনার নববিকাশ এবং দশসালা পরিকল্পনা ও সনদে প্রদত্ত সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা ওআইসিকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে। সংস্থাটি এখন একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সঙ্কট মোকাবেলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত। বর্তমানে ওআইসি বিশ্ব সংহতি, উন্নয়ন ও প্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম একটি নেতৃস্থানীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ওআইসির এতসব অর্জনের পরও বাংলা ভাষায় এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণাধর্মী কাজ হয়নি। ফলে মুসলিম বিশ্বে ওআইসির ভূমিকা বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে এর অবদানগুলো বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষক ও কৌতূহলীদের অজানাই রয়ে গেছে। এমতাবস্থায় উপর্যুক্ত পর্যালোচনার আলোকে অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হয়েছে। আলোচনার

Dhaka University Institutional Repository

সুবিধার্থে ও পাঠকের নিকট অধিকতর বোধগম্য করে তোলার জন্য অভিসন্দর্ভটি মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রতিটি অধ্যায়কে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: প্রথম অধ্যায়কে ৫টি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ওআইসি প্রতিষ্ঠার পটভূমি আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওআইসির প্রতিষ্ঠাকালীন পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ওআইসির সদস্য দেশ, পর্যবেক্ষক দেশ ও সংস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ওআইসির সাংগঠনিক কাঠামো এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে ওআইসির অঙ্গসংগঠনগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: দ্বিতীয় অধ্যায়ে ওআইসির পুনর্গঠন সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ওআইসির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্ন ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে গৃহীত পুনর্গঠন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তাবলী আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: তৃতীয় অধ্যায়ে ওআইসির সংস্কার কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: চতুর্থ অধ্যায়কে ২টি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ওআইসি এর কার্যাবলী আলেচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মুসলিম বিশ্বে শিক্ষা বিস্তারে ওআইসি এর অবদান আলোচনা করা হয়েছে। দুটি পরিচ্ছেদেই ওআইসির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: পঞ্চম অধ্যায়ে পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় ওআইসিকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে এর সনদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিচার বিশ্লেষণ করে সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভটি বাংলা ভাষায় ওআইসি এর বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যালোচনার ক্ষেত্রে নবতর সংযোজনের ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে পরিগণনের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা: নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা

১ম পরিচ্ছেদ

ওআইসি প্রতিষ্ঠার পটভূমি

ওআইসির উদ্ভব ঘটে সাম্প্রতিক বিশ্ব ইতিহাসের কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে। মূলত সংস্থাটি মুসলিম দেশগুলোর আন্ত:রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও সংহতির ধারণাকে একটি আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রদানের লক্ষ্যে মুসলিম জনমানসে দীর্ঘদিন ধরে অনুরণিত থাকা একটি চাহিদার মূর্ত বহি:প্রকাশ। মাসজিদুল আকসায় অগ্নি সংযোগের ঘটনাই যে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার জন্ম দেয়, এই ধারণা সর্বাংশে সঠিক নয়। তবে এই কথা ঠিক যে, ঐ ঘটনাই মুসলিম উম্মাহকে আবার একই মঞ্চে একত্র হইতে সাহায্য করেছে। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের দু:খজনক পরিণতি মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বিশ্ব মুসলিমের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নূতনভাবে চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য করে। এই দুইটি ঘটনা ছাড়াও ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার একটি দীর্ঘ ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মুসলিম বিশ্ব তদানীন্তন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে উন্নীত হয়। চার খলিফার শাসনামল পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ব এক ও অখন্ড ছিল। তাঁহাদের ৩০ বছর শাসনামলের পর শুরু হয় ইসলামী ঐক্যে ভাঙ্গন। উমাইয়াদের অভ্যুত্থান সেই ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করে। উমাইয়াদের ৯০ বছরের শাসনামল (৬৬১-৭৫০) এবং আব্বাসীয়দের ৫০৮ বছরের শাসনামল (৭৫০-১২৫৮) ইসলামের ইতিহাসে গৌরবোজ্জল সোনালী অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিয়েছে, কিন্তু বিশ্ব মুসলিমকে এক মঞ্চে, এক আদর্শের পতাকাতলে, এক আদর্শের ভিত্তিতে জমায়েত করা সম্ভব হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তেমন উদ্যোগও ছিল না। খলিফা উপাধি ধারণ করিয়া ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শত শত লোক দেশ শাসন করিয়ছেন, কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীনের সেই মহান আদর্শকে অনুসরণ করিয়া মুসলিম উম্মাহকে পরিচালনা করিয়াছেন বা পরিচালনার চেষ্টা করিয়াছেন এমন খলিফার সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। ফলে তাওহীদি ঐক্যে মুসলিম উম্মাহ সংঘবদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

হইতে পারে নাই। কোন কোন মুসলিম শাসক এই উদ্দেশ্যে নিজ নিজ সীমানায় তৎপরতা দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের ব্যক্তিগত শাসনামল শেষ হওয়ার পর আবার ঐক্যের সূত্র শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং অনৈক্যই অনিবার্য হইয়া উঠে।[১] এর ফলে এক সময় মুসলিম জাহান ৩টি খিলাফতের অধীনে বিভক্ত হইয়া পড়ে:

১. বাগদাদের আব্বাসী (৭৫০–১২৫৮);
২. স্পেনের উমাইয়া (৭৫৬–১৪৯২);
৩. মিসরের ফাতিমী খিলাফত (৯০১–১১৭১)।

উল্লেখ্য, ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১শ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতায় মুসলমানদের একক বিচরণ ছিল। ১১শ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব মুসলমান ও ইউরোপীয়দের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছে। ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দের পর মুসলমানরা হারিয়ে যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্র থেকে। পঞ্চদশ শতকের শেষে স্পেন মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে অন্ধকারে ডুবে যায় মুসলিম বিশ্ব।[২] তখনকার মুসলিম শাসকগণ যতটা মুসলিম নামে পরিচিত ছিলেন ততটা ইসলামের নামে পরিচিত ছিলেন না। ইসলাম হইতে মুসলিম শাসকরা যতই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, ঐক্যের বদলে ততই অনৈক্য প্রভাবশালী হইতে লাগিল। এই সুযোগে ইসলামের শত্রুরা ঐক্যবদ্ধ হইতে লাগিল। এক এক করিয়া ধীরে ধীরে মুসলিম ভূখন্ড অমুসলিমদের করতলগত হইতে লাগিল, ইউরোপীয় শক্তির উত্থান ঘটিল, আর ঐ একই সময়ে মুসলিমদের পতন শুরু হইল। উসমানী খিলাফতের উচ্ছেদের পর মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক কেন্দ্র বলিতে আর কিছু অবশিষ্ট রইল না।

সাইয়্যেদ জামাল উদ্দীন আফগানী[৩] বিশ্ব মুসলিমকে এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্যান-ইসলামিজমের[৪] আন্দোলন করেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি সফল হইতে পারেন নাই। তবে তিনি

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (ঢাকা, ১৯৮৮, খ-৫), পৃ. ৩৬১।

২. ড. আবদুল ওয়াহিদ, *মুসলিম বিশ্বের ঐক্য*, (ঢাকা: আরাফাত বুকস এন্ড বুকস, ২০০৬), পৃ. ২৩৮।

৩. জামাল উদ্দীন আফগানী (১৮৩৮-১৮৯৭) বা জামাল উদ্দীন আসাদাবাদী। তার জন্মসূত্রতা নিয়ে মতদ্বৈততা আছে। তার নিজ তথ্য অনুযায়ী তিনি জন্মসূত্রে আফগান এবং সুন্নী মতাবলম্বী, কিন্তু ঐতিহাসিকদের গবেষণায় তিনি পারসী এবং শিয়া মতাবলম্বী। তিনি স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কঠোর সমালোচক ছিলেন। তার প্রচারাভিযান এবং সৈয়দ আহমদের আদর্শ মূলত একই ধারায় নিহিত–বিশ্ব মুসলিম ও মুসলিম রাষ্ট্রের উন্নতি এবং সেই উন্নতিতে পাশ্চাত্যের সহযোগিতা কামনা। তবে একই চিন্তা-চেতনা আবেগে তিনি আবার পাশ্চাত্যের ঘোর বিরোধী এবং জিহাদের সমর্থক ছিলেন। পারস্যের নাসিরউদ্দিন শাহ ১৮৯১ সালে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করেন, এবং শেষ জীবনে তিনি তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের দরবারে অনেকটা গৃহবন্দী অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেন। বিস্তারিত: এ বি এম হোসেন, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস: অটোমান সাম্রাজ্য থেকে জাতিসত্তা রাষ্ট্র*, (ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১৩), পৃ. ১০২।

৪. প্যান-ইসলামি মতাদর্শের মূল ভিত্তি ছিল একই খলিফার অধীনে সমগ্র মুসলিম জাহানকে একতাবদ্ধ করা। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আব্বাসীয় বংশের পতনের পর মুসলিম সাম্রাজ্য খন্ডবিখন্ড হয়ে পড়ে এবং এই বিচ্ছিন্নতার কারণে উনবিংশ শতাব্দীতে বহু মুসলিম দেশই ইউরোপীয় শক্তির আওতাধীন আসে। প্যান-ইসলামি চিন্তাধারা তুরস্কে নব্য-তুর্কীদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিশ্বকে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আব্বাসীয় শাসনামলের শেষের দিকে মুসলিম দেশগুলো ইউরোপীয় আধিপত্যের শিকারে পরিণত হয়। মুসলিম জাতিকে ইউরোপীয় হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ[৫] ঐক্যের ডাক দেন। সেই ডাক মুসলিম বিশ্বে ঝড়ো হাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই হাওয়া অনৈক্যের ভিত উপড়াইয়া ফেলিয়া ঐক্যকে সুসংহত করতে পারে নাই। খিলাফতের যে ক্ষীণ আশাটুকু মুসলমানদের মধ্যে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিল তাহাও কামাল আতাতুর্কের এক ঘোষণায় শেষ হইয়া গেল।[৬]

১৯২৪ সালে খেলাফত ব্যবস্থার অবলুপ্তির পর মুসলিম ঐক্য প্রকাশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিষয়ে এক বিশাল শূণ্যতার সৃষ্টি হয়। মুসলিম ঐক্যের প্রতীক সর্ববৃহৎ এই প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের বিলোপের পর মুসলিম চিন্তাবিদ, নেতৃত্ব ও পন্ডিতবর্গের অনেকেই ইসলামী ঐক্যের বাহ্যিক প্রকাশের জন্য একটি বিকল্প কাঠামো তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ কারণে মুসলিম চিন্তাবিদগণ একটি বিকল্প ব্যবস্থা খোঁজার জন্য তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। যার ফলশ্রুতিতে বিশ্ব মুসলিম সমাজে এবং নেতৃত্বের মাঝে একটি ইসলামী সংগঠন স্থাপনের লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়।

এ বিষয়ে প্রথমে উদ্যোগ নেন ওসমানীয় খেলাফত ব্যবস্থার সর্বশেষ খলিফা সুলতান আবদুল মজিদ (দ্বিতীয়)।[৭] তিনি খেলাফত ব্যবস্থার পুন:স্থাপনের প্রচেষ্টা চালান। খেলাফত বিলুপ্তি এবং

বিশেষ করে নামিক কামাল প্রমুখের মধ্যে উন্মেষ হয়। নিজ সাম্রাজ্যে অতুর্কী বিশেষ করে বিশাল আরব বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীর আনুগত্য লাভের জন্য সুলতান আবদুল হামিদ এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। আবদুল হামিদের রাজত্বে আলেপ্পোর শেখ আবুল হুদা ছিলেন একজন প্যান-ইসলামি আদর্শবাদী। তিনি ওয়াহাবী মতবাদের বিরোধী ছিলেন। আবুল হুদার প্যান-ইসলামি আদর্শ কেবল আবদুল হামিদের রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বৈদেশিক হামলা থেকে তুরস্ককে রক্ষা করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্যান-ইসলামিজমের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান প্রতিভূ ছিলেন সৈয়দ জামালউদ্দিন আফগানী। বিস্তারিত: ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব*, (ঢাকা: উত্তরণ, ২০০৪), পৃ.২০২।

৫. ১৮৭৬ খৃ. তিনি তুরস্কের সিংহাসনে বসেন এবং একই বছরের ১০ ডিসেম্বর সংবিধান জারি করেন। তিনি তুরস্কের যোগ্যতম সুলতানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কিন্তু রুশ-তুরস্ক যুদ্ধে তুরস্কের বিপর্যয়, বৈদেশিক নীতির ব্যর্থতা এবং নব্য-তুর্কী আন্দোলনজনিত নীতির অভ্যন্তরীণ গোলযোগ আবদুল হামিদের রাজত্বকালকে এক কলুষিত অধ্যায়ে পরিণত করে এবং তিনি নিজেও সেই পরিস্থিতির শিকার হন। বিস্তারিত: ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আধুনিক মুসলিম বিশ্ব: তুরস্ক-ইরান-আফগানিস্তান*, (ঢাকা: নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১২), পৃ. ৮৯।

৬. (A resolution of the National Assembly of March 3, 1924, dissolved the caliphate and banished its incumbent from the country).বিস্তারিত: Carl Brockelmann, *History of the Islamic People*, (London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1964), p. 443.

৭.উসমানীয় খেলাফতের শেষ খলিফা। ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ জাতীয় মহা পরিষদ খিলাফত বিলুপ্ত ঘোষণা করে। পরদিনই খলিফা আবদুল মজিদ কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ করেন। ফলে তুরস্কে প্রায় ৬৪০ বছরের পুরনো উসমানিয় শাসনের অবসান ঘটে। বিস্তারিত: এম এ কাউসার, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস*, (ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ২৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাসনে যাওয়ার কিছুদিন পরেই তিনি সুইজারল্যান্ডে এক সংবাদ সম্মেলন আহবান করেন এবং খেলাফত বিলুপ্তি সংক্রান্ত তুরস্কের সংসদীয় অধ্যাদেশকে প্রত্যাখ্যান করেন। এছাড়াও তিনি একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে খেলাফত বিলুপ্তির কারণে মুসলিম বিশ্ব যে এক অস্থির পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের প্রতি জোর আহবান জানান।[৮]

১৯২০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে খেলাফত পুনরুদ্ধারের উদ্যোগগুলো কেবল উসমানীয় খলিফার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নয়, বরং ইসলামি সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি রাজনৈতিক দাবীতে পরিণত হয়। এই দাবীর সমর্থকদের মতে ইসলামি সংহতি কেবল খেলাফত পুনরুদ্ধারেই নয় বরং উপনিবেশবাদ ও বহুধাবিভক্ত মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহ যেসব সঙ্কট মোকাবেলা করে চলেছে তার সমাধানের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এ প্রসঙ্গে একদিকে মুসলিম চিন্তাবিদ ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যেমন উদ্যোগ নিচ্ছিলেন, অপরদিকে মুসলিম দেশগুলোর বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন প্রস্তাব ও উদ্যোগের মাধ্যমে ইসলামি সহযোগিতা ও সংহতির বিষয়টিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এ পর্যায়ে খেলাফত পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা গতি হারিয়ে ফেলে এবং সবাই মোটামুটি এর বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছিল। তবে মুসলিম ঐক্য প্রকাশের যে কোনো একটি সমন্বিত কাঠামোর যে প্রয়োজনীয়তা সেটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জাতিপুঞ্জ (League of Nations) এর প্রতিষ্ঠা মুসলিম জনমানসে নতুন আশার সঞ্চার করে। মুসলিম দেশগুলো বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজস্ব সমস্যা আলোচনার সুবিধার্থে একটি সাধারণ মঞ্চ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠে।[৯]

❖ ওআইসি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগসমূহ:

১. বিশ্বযুদ্ধ অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়:

১৯২৪ সালে খেলাফত ব্যবস্থার বিলুপ্তির পর মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন পন্ডিত ব্যক্তি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি সভা আয়োজনের পরিকল্পনা করেন। এ লক্ষ্যে মিসরের তৎকালীন বাদশাহ প্রথম ফুয়াদের সমর্থনে একটি ইশতেহার প্রকাশিত হয় যাতে

---

৮. Mona F. Hassan, *Loss of Caliphate: The Trauma and Aftermath of 1258 and 1924*, Ph.D Thesis, (Princeton University, 2009), p.29.

৯. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, অনুবাদ: মো:আমানুল হক,"*নব্য শতকে মুসলিম বিশ্ব: ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (১৯৬৯-২০০৯)*", (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৩), পৃ-১৫।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কংগ্রেস অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়।[১০] আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রেক্টর মিসরের স্থানীয় দলগুলোর সমর্থন লাভের জন্য বেশ কিছু কমিটি গঠন করেন যাদের দায়িত্ব ছিল জনগণকে এই উদ্যোগের সমর্থনে উদ্বুদ্ধ করা। এই কংগ্রেসকে সফল করে তুলতে একটি স্থায়ী সচিবালয়ও স্থাপন করা হয় সে সময়। ১৯২৬ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত হয় কায়রো কংগ্রেস, যাতে অংশগ্রহণ করে ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, মালয়, মরক্কো, ভারত, পোল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইয়েমেন ও মিসরের প্রতিনিধিবৃন্দ। খেলাফত পুনরুদ্ধারে এই কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পরলেও মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং খেলাফত পুনরুদ্ধারের বিষয়টিকে অবহেলা না করার বিষয়টি গুরুত্বের সহিত আলোচিত হয়। এছাড়া খেলাফত পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রস্তাবনা এ সময়ে উত্থাপন ও আলোচনা করা হয়। উদাহরণ হিসেবে শেখ মুহাম্মদ জাওয়াহিরি'র প্রস্তাবনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যিনি পরবর্তীতে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বলেন যে এ ধরনের একটি কংগ্রেস যা আরো বেশি প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে যদি একজন খলিফা নির্ধারন করতে সক্ষম হয় তবে তা ইসলামি শরীয়াহ অনুযায়ী বৈধ হবে কেননা তা মুসলিম ঐকমত্যের প্রতিফলন বলে বিবেচিত হবে।[১১]

খেলাফতের বিকল্প ব্যবস্থা সংক্রান্ত এ ধরনের প্রস্তাবনাগুলো বেশ কিছু সমাজ সংস্কারক ও পন্ডিত ব্যক্তিকে উৎসাহিত করে তোলে। এক্ষেত্রে আবদুল রাজ্জাক আল সানহুরি'র কথা উল্লেখ করা যায় যিনি কায়রো সম্মেলনের ধারণাগুলো থেকে প্রেরণা লাভ করে তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধ "Le Califat" প্রণয়ন করেন। এ নিবন্ধে তিনি ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থাকে একটি আধুনিক শাসনব্যবস্থা হিসেবে রূপান্তরের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।[১২] তিনি যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন যে যেহেতু একটি নিয়মিত খেলাফত ব্যবস্থা পুন:স্থাপনের বিষয়টি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে সেহেতু এক্ষেত্রে বিকল্প খেলাফত ব্যবস্থার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এই বিকল্প ব্যবস্থায় খলিফা একটি নির্দিষ্ট পরিবারের সদস্য হিসেবে উত্তরাধিকার সূত্রে মনোনীত না হয়ে বিশ্বব্যাপী মুসলিম প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। এতে সৃষ্ট শাসনব্যবস্থার দুটো শাখা থাকবে-ধর্মীয় ও রাজনৈতিক। দুটো শাখাই পৃথকভাবে নির্বাচিত একজন সভাপতির অধীনে পরিচালিত হবে। ধর্মীয় শাখার অধীনে একটি ইসলামি ধর্মীয় ব্যবস্থা সংক্রান্ত সংগঠন থাকবে যার অবকাঠামোতে একটি

---

১০. John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, (London: Oxford University press, 1995), V-2, p. 309.

১১. Martin Kramer, *Islam Assembled: The Advent of the Muslim Congress*, (New York: Columbia University Press, 1986), P. 101.

১২. A. Sanhoury, *The Caliphate, its evolution towards a Society of Eastern nations*, (Paris: P. Geuthner, 1926), P.570.

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ পর্ষদ ও মুসলিম জনগোষ্ঠীসমূহের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বকারী একটি সাধারণ সংসদের বিধান থাকবে। উচ্চ পর্ষদের আওতায় থাকবে ইসলামি ইবাদত বন্দেগী, তীর্থযাত্রা, শিক্ষা, অর্থ ও বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়াদি। আর রাজনৈতিক শাখাটি প্রাচ্যের জাতিগুলোর একটি মৈত্রী সংঘ হিসেবে বিবেচিত হবে। এটি সদস্য দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা এবং বহি:নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করবে যাতে করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তি নিশ্চিত করা যায়। আল সানহুরির মতে এই দ্বিতীয় শাখাটির প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য পুরোপুরি নির্ভর করবে মুসলিম বিশ্বের জন্য জ্ঞানের সব শাখাগুলোতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক এক নবজাগরণের সাফল্যের ওপর। আর এই রাজনৈতিক শাখার পরিপূর্ণ বিকাশের পর ইসলামি ধর্মীয় বিষয়াবলি সংক্রান্ত সংগঠন বা প্রথম শাখাটি দুটো শাখারই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং এভাবে একটি আধুনিক ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

কায়রো কংগ্রেসের পর সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে বাদশাহ আবদুল আজিজ ইবনে সউদের[১৩] আমন্ত্রণে ১৯২৬ সালের জুন মাসে আরও একটি ইসলামি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আফগানিস্তান, মিসর, ভারত, ফিলিস্তিন, মালয়, তুরস্ক, সিরিয়া, সুদান, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইয়েমেনসহ বেশ কিছু মুসলিম দেশের প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক প্রতিনিধিসহ অত্যন্ত সম্মানিত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।[১৪] এতে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল একটি স্থায়ী সংগঠন স্থাপনের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই উদ্যোগকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান। সম্মেলনে "ইসলামি বিশ্বের কংগ্রেস" নামে একটি সংগঠন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যা প্রতি বছর মক্কায় এক সভায় মিলিত হবে। ১৯৩১ সালে এই কংগ্রেসের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কায়রো ও মক্কা সম্মেলনের পরের বছর নবতুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মোস্তফা কামাল, যিনি খেলাফত ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করেন, এই ব্যবস্থা বিলুপ্তির ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রস্তাবের প্রতি অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত করেন। ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে ৬ দিনব্যাপী আয়োজিত এক বিস্তৃত বক্তৃতায়[১৫] তিনি বলেন যে ভবিষ্যতে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম সম্প্রদায়গুলো যখন স্বাধীনতা অর্জন করবে, তখন তাদের প্রতিনিধিরা একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে একটি উচ্চ

---

১৩. আবদুল আজিজ ইবনে সউদ (২৪ নভেম্বর ১৮৮০-৯ নভেম্বর ১৯৫৩) সৌদি আরবের প্রথম বাদশাহ ছিলেন। তিনি রিয়াদ শহরে ওয়াহাবী রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে তিনি সৌদি আরব নামকরণ করেন। তার শাসনামলেই ১৯৩৩ সালে তেল অনুসন্ধান এবং সেই সাথে দেশটির ভবিষ্যৎ উন্নতির সূচনা হয়। বিস্তারিত: ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *আধুনিক মুসলিম বিশ্ব: তুরস্ক-ইরান-আফগানিস্তান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯১-৪৯৫।

১৪. Kremer, প্রাগুক্ত, পৃ-১০৭।

১৫. ৫৪৩ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বিস্তৃত বক্তৃতা তুর্কিজাতি ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। বিস্তারিত: মুহম্মদ আলী আসগর খান, *আধুনিক তুরস্কের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

পর্ষদ গঠন করবে যার উদ্দেশ্য হবে ঐক্যবদ্ধভাবে বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করা। তিনি আরো বলেন যে এভাবে একটি "প্যান-ইসলামি" যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার গোড়াপত্তন হবে তাকে "খেলাফত" নাম দেয়া যেতে পারে এবং যে ব্যক্তি সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হবেন তাকে "খলিফা" উপাধি দেয়া যেতে পারে। তিনি আরও বলেন যে সমগ্র বিশ্বের সমস্যা মোকাবেলা ও সমাধানের দায়িত্ব কোনো এক ব্যক্তি বা এক রাষ্ট্রের উপর ছেড়ে দেয়া কোনোভাবেই সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হতে পারে না।[১৬]

১৯৩১ সালের জুলাই মাসে মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা ও মুসলিম সম্প্রদায়গুলোর সংকট উত্তরণের উপায় নির্ধারণের লক্ষ্যে ফিলিস্তিনের প্রধান মুফতি আমিন আল হুসাইনি জেরুজালেমে একটি সম্মেলন আহবান করেন। এতে মূল আলোচিত বিষয় ছিল ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সংকটময় পরিস্থিতি। যাতে ফিলিস্তিনে ক্রমবর্ধমান ইহুদী অধিবাসীদের আগমন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা এবং ফিলিস্তিনে একটি সম্ভাব্য ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলার বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও ফিলিস্তিনে মুসলিম পবিত্র স্থানসমূহ রক্ষা ও জেরুজালেমে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়গুলোও সম্মেলনে আলোচিত হয়। বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের এবং "দ্বিবার্ষিক বিশ্ব কংগ্রেস" অনুষ্ঠানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ফিলিস্তিনের প্রধান মুফতি বিশ্ব কংগ্রেসের সভাপতি ও মিসর এবং ভারতের প্রতিনিধিদলের দলপতিদ্বয় সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। জেরুজালেম এই কংগ্রেসের সভাস্থল হিসেবে মনোনীত হয়।[১৭] এই উপমহাদেশ হইতে যে কতিপয় নেতা সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আল্লামা ইকবাল।[১৮]

প্যারিসে বসবাসকারী মুহাম্মদ সেলিম নামে একজন মিসরীয় সাংবাদিক যিনি জেরুজালেম কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেছিলেন, ইউরোপীয় মুসলিমদের নিয়ে একই ধরনের একটি সম্মেলন আয়োজনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। দু'বছর প্রচেষ্টার ফলে জনাব সেলিম ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেনেভা নিবাসী সাকিব আরসালান নামে একজন লেবাননীর বিশেষ সহযোগীতায় "ইউরোপিয়ান মুসলিম কংগ্রেস" অনুষ্ঠান আয়োজনে সক্ষম হন।[১৯] এতে ইউরোপীয় মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফিলিস্তিন এবং উত্তর আফ্রিকার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ

---

[১৬]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৭।

[১৭]. প্রাগুক্ত, পৃ- ১৮।

[১৮]. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬১।

[১৯]. Kremer, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

করে।[২০] এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল "মুসলিম বিশ্ব ও পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বন্ধন তৈরি করা।"[২১]

২. বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়:

১৯৫০-এর দশকে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে শীতল যুদ্ধের বেশ উত্তেজনাকর বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যা বিশ্ব রাজনীতিতে দ্বিমেরুভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সৃষ্টির পাশাপশি বিশ্ব ভূ-রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করে। এ পরিবর্তন মুসলিম দেশগুলোকে একই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার উদ্যোগগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নব্য স্বাধীনতা লাভকারী মুসলিম দেশগুলোও নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা প্রচন্ডভাবে অনুভব করে। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ইসলামি বিষয়াবলীতে সহযোগিতা বাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়ে আন্ত:রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরির বেশ কিছু পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়।

ওআইসি প্রতিষ্ঠার কারণগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে বেশ কিছু জটিল পরিস্থিতির তৈরি হয় যার ফলে মুসলিম দেশগুলো পারস্পরিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। সাদ খান তার গবেষণায় বেশ কিছু পরিস্থিতির উল্লেখ করেছেন[২২]-

- প্রথমত, নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো নিজস্ব সার্বভৌমত্বের এক বিশেষ প্রকাশভঙ্গি হিসেবে অন্যান্য দেশের সাথে সমমর্যাদার ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। এই প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায় মুসলিম বিশ্বে। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশ যেহেতু উপনিবেশবাদ হটানো ও স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে প্রচুর শ্রম ও সময় ব্যয় করেছে সেহেতু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভের পর তারা নিজস্ব কার্যক্রম স্বাধিকারের ভিত্তিতে নিজেরাই পরিচালনা করার সুযোগ লাভের জন্য তাদের ঔপনিবেশিক শাসনকর্তাদের প্রভাবমুক্ত একটি নিজস্ব বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছে।

---

২০. Saad Khan, *Reasserting International: A Focus on the Organization of the Islamic Conference and Other Islamic Institutions,* (London: Oxford University Press, 2001), P. 13.

২১. Mohammad El Sayed Selim (Edited),*The OIC in a Changing World,* (Cairo University, 1994), P. 15.

২২. Saad Khan, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

- দ্বিতীয়ত, এসব দেশে যারা জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নিজ নিজ দেশকে স্বাধীনতার পথে নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা তৃতীয় বিশ্বভিত্তিক সহযোগিতা এবং ইসলামি সংহতির ভিত্তিতে নিজস্ব জাতীয়তাবাদী ধারণার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন।
- তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক স্বার্থে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ইসলামি সংহতির অনুপ্রেরণায় ঐক্যবদ্ধ হতে চেয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে অধিকাংশ মুসলিম দেশের অর্থনীতি ছিল তাদের ঔপনিবেশিক শাসক দেশের ওপর নির্ভরশীল যা স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়েও অব্যাহত ছিল। এর ফলে মুসলিম দেশগুলো উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন। আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের একটি অন্যতম কার্যকর পন্থা হচ্ছে সাধারণভাবে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বৃদ্ধি।
- চতুর্থত, ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর অবর্ণনীয় দুর্দশা এবং অন্যান্য আঞ্চলিক রাষ্ট্রের ওপর ইসরায়েলি আগ্রাসনের ফলে মুসলিম জনমানসে প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর ফলে ইসলামি সংহতির ভিত্তিতে ইসরায়েলি হুমকির প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান প্রচন্ড শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এহেন পরিস্থিতিতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতি সংক্রান্ত একটি প্লাটফর্ম তৈরির লক্ষ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। এসব উদ্যোগ ভিন্ন ভিন্নভাবে নেয়া হলেও একে অপরের পরিপূরক এবং একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত ছিল। প্রতিটি উদ্যোগ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা পরবর্তীতে ইসলামি সম্মেলন সংস্থা তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেসব উদ্যোগের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল-

- মুসলিম বিশ্ব কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির অব্যবহিত পরে ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান দেশটির তৎকালীন রাজধানী করাচিতে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি অর্থনৈতিক সম্মেলনের আয়োজন করে।[২৩] দেশটির প্রথম ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান (১৪ আগস্ট ১৯৪৭-১৬ অক্টোবর ১৯৫১) এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এতে তিনি একটি ইসলামি ব্লক তৈরির আহবান জানান যেটি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সকল সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। উক্ত সভায় ১৯২৬ সালে মক্কা সম্মেলনে গৃহীত একটি সিদ্ধান্তকে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং "মুসলিম বিশ্ব কংগ্রেস" (Muslim World Congress) কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়। এই সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো চূড়ান্ত

---

২৩. John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, (London: Oxford University press, 1995), V-3, p. 261.

Dhaka University Institutional Repository

করা হয় ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত পরবর্তী সভায়। সভায় আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে এর সদর দফতর হবে পাকিস্তানের রাজধানীতে। এতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী একটি ইসলামি ব্লক তৈরির আহবান জানান যেটি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। সম্মেলনে পাকিস্তানের এক মন্ত্রী মুসলিম দেশগুলোকে পরস্পরের প্রয়োজনের সময় সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ সংগঠনে যোগ দেয়ার আহবান জানান।[২৪] ১৯৬২ সালে বাগদাদে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ কংগ্রেসে এই সংগঠনের সংবিধান গৃহীত হয়। প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম বিশ্ব কংগ্রেস পরবর্তী বছরগুলোতে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন শহরে এর সভার আয়োজন করে। এছাড়া ১৯৫২ সালে ফিলিস্তিনের প্রধান মুফতি আমিন আল হুসাইনীর উদ্যোগে মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় পন্ডিতদের এক সভা পাকিস্তানের করাচিতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় তিনি ইসলামি ঐক্য (Islamic Unity) প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি পশ্চিমা বিশ্ব ও পুঁজিবাদী শক্তির ঐক্যের কথা উল্লেখ করে বলেন একমাত্র ঐক্যই পারে মুসলিম উম্মাহর হাজারো সমস্যা দূর করতে।[২৫]

- ইসলামি বিষয়াবলী সংক্রান্ত উচ্চ পর্ষদ

অন্যদিকে ১৯৫৪ সালে মিসর, সৌদি আরব ও পাকিস্তান একটি সাধারণ ইসলামি সম্মেলন আয়োজনের লক্ষ্যে আলোচনা শুরু করে। এ লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে সৌদি বাদশাহ আল সউদ, মিসরের আনোয়ার সাদাত ও পাকিস্তানের গোলাম মোহাম্মদ এক যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[২৬] ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে গৃহীত এই সংগঠনের সনদে রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়াও সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ডের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। এই সংগঠনের স্থায়ী সচিবালয় হয় কায়রোতে এবং আনোয়ার সাদাত এর মহাসচিব হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই সংগঠন বেশি দিন টিকতে পারে নাই। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান সংগঠনটি থেকে সরে দাঁড়ায় এবং ১৯৫৮ সালে মিসর ও সৌদি আরবের পারস্পরিক দূরত্ব বৃদ্ধির কারণে সংগঠনটি অচল হয়ে পরে। মিসর সংগঠনটিকে পরবর্তীতে একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে এবং এর নাম দেয় "ইসলামি বিষয়াবলী সংক্রান্ত উচ্চ পর্ষদ" (Supreme Council for Islamic Affairs)।[২৭]

---

[২৪]. Noor Ahmad Baba, *OIC: Theory and Practice of Pan-Islamic Cooperation*, (New Delhi: Sterling Publishers, 1994), P. 32.

[২৫]. (Only the Muslims in the face of so many difficulties and problems have so far to form themselves into an Ummah).বিস্তারিত: John L. Esposito, ibid, 261.

[২৬]. Saad Khan, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

[২৭]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু,প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

Dhaka University Institutional Repository

- রাবেতা আল আলম আল ইসলামি বা বিশ্ব মুসলিম লীগ

১৯৬০ এর দশকে বর্ণিত উদ্যোগগুলোর পাশাপাশি ইসলামি সংহতির ধারণাকে বাস্তব রূপ দেয়ার লক্ষ্যে সৌদি আরব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। তৎকালীন সৌদি বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আজিজ আল সউদ এ ধারণার প্রধান সমর্থক ছিলেন। তিনি এ লক্ষ্যে পকিস্তান, ইরান, জর্ডান, সুদান, তুরস্ক, মরক্কো, গিনি, মালি এবং তিউনিশিয়া সফর করেন এবং এ ধারণাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৬২ সালে মক্কানগরীতে এক ইসলামিক সম্মেলনের আয়োজন করেন যাতে মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করে। এ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান রাবেতা আল আলাম আল ইসলামি বা বিশ্ব মুসলিম লীগ।[২৮] এটি পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শাখাসহ একটি বড় এনজিও হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[২৯] ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে রাবেতা আল আলাম আল ইসলামির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব মুসলিম সম্মেলন। সেই সম্মেলনে বাদশাহ ফয়সাল ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের আহবান জানান।[৩০]

- মুসলিম কমনওয়েলথ

১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধের দু:খজনক পরিণতি মুসলিম জাহানের ঘুমন্ত অনুভূতিকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারেন যে, মুসলমানগণ যাহারা সংখ্যায় বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ হওয়া সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ না থাকার কারণে কত অসহায়। ১৯৬৮ সালে মালয়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী টিংকু আবদুর রহমান যিনি পরবর্তীতে ওআইসির মহাসচিব নির্বাচিত হন, একটি মুসলিম সম্মেলন আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালের ২১ এপ্রিল কুয়ালালামপুরে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৯ এপ্রিল তা শেষ হয়।[৩১] সম্মেলনে অনেক বিষয়ের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল মুসলিম দেশ ও জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইসরায়েলি আগ্রাসন ও ইসরায়েল কর্তৃক মুসলিম পবিত্র স্থানসমূহ দখলের প্রসঙ্গ। এছাড়া মুসলিম দেশগুলোতে আন্ত:বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং ধর্মীয় বিষয়াবলিও সম্মেলনের আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মাঝে ছিল মুসলিম পারিবারিক

---

[২৮]. John L. Esposito, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১।

[২৯]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু,প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

[৩০]. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২।

[৩১]. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আইনের মত সাধারণ বিষয়াবলি ছাড়াও একই দিনে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ঈদ উদযাপনের লক্ষ্যে চাঁদ দেখা বিষয়ে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে আসার প্রচেষ্টা সংক্রান্ত বিতর্কিত বিষয়।[৩২]

এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সহযোগিতা ও সংহতি সংক্রান্ত মুসলিম উম্মাহর আশা পূরণে সক্ষম একটি ইসলামি সংগঠন ও ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। ডিসেম্বর ১৯৬৪-জানুয়ারি ১৯৬৫ সালে বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেসের ষষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয় সোমালিয়ার মোগাদিসু শহরে। উক্ত সভায় সোমালিয়ার রাষ্ট্রপতি আদেন আবদুল্লাহ ওসমান মুসলিম দেশগুলোর অংশগ্রহণে একটি আন্ত:রাষ্ট্রীয় সংগঠন তৈরির প্রস্তাব করেন এবং এ লক্ষ্যে একটি ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের আহবান জানান। একই সভায় বাদশাহ ফয়সালও মুসলিম জনগোষ্ঠীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সংগঠন স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সভার ফলাফলের ভিত্তিতে বাদশাহ ফয়সাল তাঁর প্রস্তাবনার পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য বিভিন্ন মুসলিম দেশ সফর করেন। সফরকালীন প্রতিটি সভায় তিনি ইসলামি সংহতি ও সহযোগিতার বিষয়টিকে বাস্তবে রূপ দেয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে আরও সমর্থন আদায়ের জন্য তিনি ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে মক্কানগরীতে অনুষ্ঠিত রাবেতা আলম আল ইসলামি সভায় সোমলিয়ার রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবের প্রশংসা করেন ও সমর্থন জানান। তিনি বলেন "আমরা মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হয়ে নিজস্ব স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের আহবানের প্রতি আমাদের সমর্থন জানাই"।[৩৩] সৌদি আরব, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, মিসরসহ অন্য আরব দেশগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম সংহতি অর্জনের লক্ষ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় তারই অংশ বিশেষ। পরবর্তীতে ওআইসি প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি হিসেবে এ উদ্যোগ গুলো কাজ করে। যদিও এর বিকাশ শুরু হয় বিশ্বযুদ্ধ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে তা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাস্তবায়নের পথে গতি অর্জন করে।

---

৩২. এসব ইসলামী ধর্মীয় উৎসবগুলো চান্দ্রপঞ্জিকা অনুযায়ী পালিত হয়। ঈদ বা এ ধরনের অনুষ্ঠানগুলো আলেমদের মতানুযায়ী চাঁদ দেখা বা না দেখার সাথে সম্পর্কিত। যার ফলে একই উৎসব বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন স্থানে উদযাপিত হতে দেখা যায়।

৩৩. Noor Ahmad Baba, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

ওআইসির গোড়াপত্তন

১৯৬৭ সালে ইসরায়েল কর্তৃক আরব এলাকায় আগ্রাসনের পর ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের বিষয়টি জরুরী হয়ে ওঠে। এর দু'বছর পর ১৯৬৯ সালের ২১শে আগস্ট ডেনিস মাইকেল নামক জনৈক অস্ট্রেলিয়ান খৃষ্টান কর্তৃক ইসলামের তৃতীয় সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আল আকসা মসজিদ আক্রান্ত হয় (অন্য এক বর্ণনায় মিখাইল রোহান নামক একজন ইহুদীর নাম উল্লেখ আছে)। সে মসজিদের একপাশে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে মসজিদের আসবাবপত্র, দেয়াল, সালাহউদ্দিন মিম্বার এবং মসজিদের দক্ষিণাংশ জ্বলে যায়। ইসরায়েলি প্রশাসন দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করে। কিন্তু আদালত তার রায়ে বলে যে, অগ্নি সংযোগকারী ব্যক্তি পাগল, তাই তার বিরুদ্ধে দন্ডবিধি কার্যকর করা যায়না।[৩৪] ইসলামের পবিত্র এই স্থান অবমাননার বিষয়টি গোটা বিশ্বের মুসলিম মানসে আঘাত হানে আর প্রচন্ড ক্ষোভের জন্ম দেয়। তবে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ কোন সংগঠন না থাকায় ফলপ্রসু প্রতিবাদ করা সম্ভব হয়নি। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফিলিস্তিনের প্রধান মুফতি আমিন আল হুসাইনী ওই দিনই মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে তারবার্তা পাঠিয়ে ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের আহবান জানান। ২৫ আগস্ট আরব লীগভুক্ত ১৪টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিসরের রাজধানী কায়রোতে এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়ে ইহুদীদের এই ধৃষ্টতা এবং অব্যাহত হুমকি ও সম্প্রসারণের মুকাবিলা করার উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা-ভাবনা করেন।[৩৫] শুধু আরব দেশগুলির পক্ষে ইহুদী হামলা মুকাবিলা সম্ভব নয়। এই আগুনের তাপ শুধু আরবদের দেহেই লাগে নাই, সকল মুসলমানদের দেহে এই আগুনের তাপ লাগিয়াছে। সুতরাং বিশ্বের সকল মুসলিম দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি শীর্ষ সম্মেলন অনতিবিলম্বে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। সৌদি সরকার এই আলোকে একটি প্রস্তাব পেশ করেন যা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত আকারে গৃহীত হয় যাতে বলা হয় যে বাদশাহ ফয়সাল ও মরক্কোর বাদশাহ হাসানের পৃষ্ঠপোষকতায় মরক্কোর রাজধানী রাবাতে এই শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।[৩৬]

শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের বিষয়টি সহজ কোনো ব্যাপার ছিল না। একদিকে শীতল যুদ্ধের (Cold War) বাস্তবতা অন্যদিকে বিভিন্ন মতাদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাবে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি ও কূটনীতিতে বিরাজমান অস্থিরতা এই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদ্যোগের প্রতিকূলে কাজ

---

৩৪. এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, *আল আকসা মসজিদের ইতিকথা*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯২), পৃ. ৯৫।

৩৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২।

৩৬. Dr. Isam Salim Shanti, *The Journey of OIC: From Rabat 1969 to Dakar 2008* (40 year anniversary special report), the OIC Journal, May - August 2009, Jeddah, Saudi Arab, p. 22.

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। তাছাড়া এ সময়ে নাসেরের বিপ্লবী মতবাদ এবং বাথ পার্টির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধ মতবাদ এ অঞ্চলের রাজতন্ত্রগুলোর জন্য অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী মতবাদ হিসেবে অগ্রহণযোগ্য ছিল।[৩৭] সর্বোপরি বাদশাহ ফয়সাল ও নাসেরের মাঝে যে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা এই শীর্ষ সম্মেলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিভিন্ন মহলের নিরলস প্রচেষ্টা ও কূটনীতির কারণে বিভিন্ন পক্ষ তাদের নিজস্ব দৃঢ় অবস্থান থেকে সরে আসে এবং অবশেষে প্রথম ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনে ঐকমত্যে পৌছতে সক্ষম হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে মরক্কো, সৌদি আরব, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজার, পাকিস্তান ও সোমালিয়ার প্রতিনিধিত্বে গঠিত কমিটি ৮-৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সালে রাবাতে শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের লক্ষ্যে মিলিত হয়। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২২-২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণে আমন্ত্রণ জানিয়ে ৩৬ টি দেশের নেতৃবৃন্দকে মরক্কোর বাদশাহ দ্বিতীয় হাসানের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়।

পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী ২২ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাবাতে ২৫টি দেশের প্রতিনিধিত্বে এই সংস্থার জন্ম হয়।[৩৮] পরবর্তীতে ২৮ জুন ২০১১ সালে কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানায় ওআইসির সদস্য দেশসমূহের ৩৮তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে সংস্থাটির নাম পরিবর্তন করা হয়। Organisation of Islamic Conference থেকে Conference শব্দটি পরিবর্তন করে Co-operation যুক্ত করে নামকরণ করা হয় Organisation of Islamic Co-operation বা ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা।[৩৯] ৪৬ বছর বয়স্ক মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী আন্তঃদেশীয় এ সংস্থার বর্তমান সদস্য দেশের সংখ্যা ৫৭টি।[৪০] তবে আরো কিছু দেশ ও সংগঠনকে অবজারভারের/পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এটি জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি সদস্য নিয়ে গঠিত এবং সদস্য সংখ্যার বিচারে জাতিসংঘের পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তঃদেশীয় আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে পরিচিত। ওআইসি সদস্য দেশগুলো সম্মিলিতভাবে বিশ্বের এক-ষষ্ঠমাংশ ভৌগোলিক এলাকা ও এক-পঞ্চমাংশের চেয়ে বেশি

---

৩৭. Naveed S. Sheikh, *The New Politics of Islam: Pan-Islamic Foreign Policy in a World of States*, (London: RoutledgeCurzon, 2003), P. 34.

৩৮. এ বি এম হোসেন, *মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস:অটোমান সাম্রাজ্য থেকে জাতিসত্তা রাষ্ট্র*, (ঢাকা:বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১৩), পৃ. ৪৯৭।

৩৯. Isam Salim Shanti (Editor), *The OIC Journal (Issued by OIC)*, June-August 2011, Jeddah, Saudi Arab, P. 16.

৪০. এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যা ধারণ করে।[৪১] বেশিরভাগ সদস্য দেশেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে মুসলিম। তবে অনেক সদস্য দেশেই 'ইসলাম' রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত কোনো ধর্ম নয়। সদস্য দেশগুলো ভৌগোলিকভাবে আরব, আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার আওতাভুক্ত হওয়ায় সংস্থাটি এক বিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক অবস্থানের সমন্বিত সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত হয়। এর সদর দফতর সৌদি আরবের জেদ্দায়।

আল আকসা মসজিদ সংক্রান্ত দু:খজনক ঘটনা ছাড়াও ইসলামি সম্মেলন সংস্থার ২৫টি সদস্য দেশের রাজা, বাদশাহ, সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ পারস্পরিক সহযোগিতা, সর্বসম্মত সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। সম্মেলনের চূড়ান্ত ইশতেহারে আল আকসা মসজিদের ওপর আঘাতের বিষয়ে তীব্র নিন্দা জানানো হয় এবং বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় আল আকসাসহ অন্যান্য মুসলিম পবিত্র স্থানের অধিকার ও অবস্থান, ১৯৬৭ সাল পূর্ববর্তী মানচিত্র অনুযায়ী জেরুজালেমকে রাজধানী করে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধের জোর দাবী জানানো হয়। তাছাড়া ইশতেহারে জেরুজালেম ও অন্যান্য দখলিকৃত ভূমি পুনরুদ্ধারে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। সম্মেলনে একটি স্থায়ী সচিবালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক সভা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। সচিবালয়ের দায়িত্বাবলীর মধ্যে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে পারস্পরিক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়।[৪২]

---

৪১. ২০০৭-এ বিশ্ব জনসংখ্যার ২১.৪ ভাগ ও ২০০৮-এ ২২.১ ভাগ। ২০০৮-এ ওআইসি দেশগুলোর মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৪৬৮.১০ মিলিয়ন (computed from SESRIC, BASEIND Database)।

৪২. শীর্ষ সম্মেলনের ইশতেহার:<www.oic-oci.org/english/conf/is/1/DecReport-1st%20IS.htm>

Dhaka University Institutional Repository

সনদ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং নীতিমালা

- সনদ অনুমোদন

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ৩য় ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে ওআইসি সনদ অনুমোদন করা হয়। এই ঐতিহাসিক সনদের ভূমিকায় মুসলিম সরকারগুলো স্বীকার করে যে, ইসলামি উম্মাহর সাধারণ বিশ্বাসই মুসলিম দেশসমূহের সংহতি ও পুনর্মিলনের বুনিয়াদ। ইহাকে সামনে রাখিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, দেশগুলো ইসলামের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করিবে। আর ইহা হইবে মানবতার অগ্রগতির জন্য তাহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সনদ ১৪টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। সনদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ওআইসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সদস্য দেশসমূহের পাঁচটি আচরণ বিধি তথা নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে।[৪৩] জাতিসংঘ সনদের ১০২ নং অনুচ্ছেদের সাথে সঙ্গতি রেখে ১৯৭৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি এই সনদ জাতিসংঘে রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হয়।[৪৪]

- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রতিষ্ঠার সময় ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয় 'এই সংস্থা তার সমগ্র সদস্য দেশসমূহের মধ্যে সংহতি; তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে সহযোগিতা; জাতিগত পার্থক্যের অবসান ও সর্বপ্রকার উপনিবেশবাদের বিরোধিতা, ফিলিস্তিনিদের জাতীয় অধিকার সংরক্ষণ ও তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি, এবং সমগ্র মুসলিমদের তাদের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও জাতীয় অধিকার আদায়ে নিয়োজিত থাকবে।[৪৫] এছাড়া সংস্থাটি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি প্রয়োজনীয় সমর্থন প্রদান এবং মুসলিম পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানের সংগ্রামকে সমন্বিত ও সুসংহত করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে।

---

৪৩. ইয়াহইয়া আরমাজানী, অনুবাদ: মুহাম্মদ ইনাম উল হক, *মধ্যপ্রাচ্য: অতীত ও বর্তমান*, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন-২০০৬), পৃ. পঁচিশ।

৪৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২।

৪৫. এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

- নীতিমালা

ওআইসি সনদ অনুযায়ী সদস্যভুক্ত দেশসমূহ যেসব মূলনীতি দ্বারা পরিচালিত হয়:[৪৬]

১. সদস্য দেশসমূহের মধ্যে পুরোপুরি সমতার নীতি;
২. সদস্য দেশগুলোর আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অবলম্বন;
৩. প্রতিটি সদস্য দেশের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, আঞ্চলিক অখন্ডতার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন;
৪. সদস্য দেশগুলোর মধ্যে কোন রকম কলহ এবং জটিলতা দেখা দিলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ-আলোচনা, মধ্যস্থতা, সম্পর্ক স্থাপন এবং সালিসীর মাধ্যমে এই সকল সমস্যার নিষ্পত্তি সাধন;
৫. কোন সদস্য দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা, জাতীয় ঐক্য কিংবা রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি হুমকি সৃষ্টি হইতে পারে এমন কোন হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকা।

❖ পতাকা

ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার আলাদা একটি পতাকা স্বীকৃত রয়েছে। সবুজ পশ্চাদপদে একটি সাদা বৃত্তের মধ্যস্থলে লাল ক্রিসেন্টের ওপরে আল্লাহু আকবর লেখা সম্বলিত এই পতাকাটি সাধারণভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বেরই প্রতিনিধিত্বকারী একটি নিশান। আল্লাহু আকবর লিপিটি মাগরেবী স্টাইলে লেখা। সম্ভবত মরক্কোতে এই সংস্থার সূচনা অধিবেশনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্তেই মাগরেবী বা পশ্চিম-ইসলামি স্টাইলে এই লেখাটি উৎকীর্ণ।[৪৭]

❖ ভাষা:

ওআইসির কর্মকান্ডে সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয় আরবি, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা।[৪৮]

---

৪৬. অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ২২ জানুয়ারি ১৯৮৭ সাল, পৃ. ১৩-১৪।

৪৭. এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৮।

৪৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

ওআইসির প্রতিষ্ঠাকালীন পর্যায়

যদিও ১৯৬৯ সালে আল আকসা মসজিদের ওপর আক্রমনের ঘটনা ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানকে ত্বরান্বিত করে, কিন্তু একটি পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে ওআইসিকে একটি দীর্ঘ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সংগঠনটি বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক এবং মুসলিম স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি বিশ্ব রাজনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন নিরস্ত্রীকরণ, সন্ত্রাস দমন এবং পরিবেশ বিপর্যয় নিয়েও সংস্থাটি কাজ করবে বলে গোটা মুসলিম বিশ্ব আশা পোষণ করে। এ বিষয়গুলোসহ আরও অন্যান্য মুসলিম স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি পরবর্তী দশকগুলোতে ওআইসি কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ওআইসির ইতিহাসে বেশ কিছু ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। এসব সম্মেলনের মাধ্যমেই এর প্রাতিষ্ঠানিক গঠন, নীতিমালা এবং কার্যসূচি গৃহীত হয়।

প্রথম ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন

১৯৭০ সালের মার্চ মাসে জেদ্দায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লইয়া ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা জন্ম নিলেও রাবাতে অনুষ্ঠিত ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনকেই ইসলামি সম্মেলন সংস্থার প্রথম শীর্ষ সম্মেলন হিসাবে গণ্য করা যায়। ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সালে রাবাতের হিলটন হোটেলে সম্মেলন শুরু হয় এবং ২৫ সেপ্টেম্বর শেষ হয়। সম্মেলন কক্ষের প্রবেশ প্রবেশ দ্বারে ইসলামি ঐক্যের সেই চিরন্তন বাণী শোভা পায় এবং সকল প্রতিনিধির দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। আল-কুরআনের আয়াত "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।"[৪৯]

এ সম্মেলনে সংগঠনটির সদস্য, গঠন এবং অবস্থান সংক্রান্ত বিভিন্নমুখী, এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী ধারণাগুলোকে একত্রিত করে মোটামুটি একটি সমন্বিত আকার প্রদান করা হয়। সম্মেলনটি আয়োজনের ক্ষেত্রে মরক্কো ও সৌদি আরবসহ বেশ কিছু প্রভাবশালী দেশকে কঠোর

৪৯. আল-কুরআন, সূরা আল ইমরান:১০৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচেষ্টা চালাতে হয়। তাবপরও ৩৬টি আমন্ত্রিত দেশের মধ্যে কেবল ২৫টি দেশ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।[৫০] মরক্কোর বাদশাহ সম্মেলন উদ্বোধন করেন। পবিত্র মসজিদুল আকসায় ইহুদীদের অগ্নি সংযোগের ঘটনার প্রতি উপস্থিত মুসলিম নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন। কোন কোন দেশ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারবে এ বিষয়েও মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। বেশ কিছু দেশ পিএলও এর অংশগ্রহণের বিষয়ে আপত্তি জানায়। তাদের মতে পিএলও একটি স্বাধীন দেশ নয় বলে স্বাধীন দেশসমূহের সম্মেলনে তার অংশগ্রহণ যুক্তিযুক্ত নয়। অন্যান্য দেশের নেতারা এ যুক্তি গ্রহণ করেননি। তাদের মতে পিএলও এর অনুপস্থিতিতে আল কুদস সংক্রান্ত আলোচনা ফলপ্রসু হবে না। এ প্রসঙ্গে আলজেরিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট "হুয়ারি বুমেদিয়েন"[৫১] সবাইকে মনে করিয়ে দেন যে ১৯৫৫ সালের বান্দুং জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে স্বাধীন দেশ না হয়েও আলজেরীয় জাতীয় ফ্রন্ট দেশটির প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এই যুক্তির আলোকে সম্মেলন পিএলওকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদায় অংশগ্রহণে সম্মতি প্রদান করে।[৫২]

সম্মেলনের আলোচ্যসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মন্ত্রী পর্যায়ের একটি প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশগুলোর মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সৌদি আরব, মরক্কো, তুরস্ক এবং ইরান সম্মেলনে সামগ্রিকভাবে আরব-ইসরাইল সমস্যা আলোচনা না করে কেবল আল আকসা মসজিদ আক্রমণ সংক্রান্ত বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে মতপ্রকাশ করে। কিন্তু মিসর, আলজেরিয়াসহ অন্যান্য দেশগুলো ফিলিস্তিন সমস্যার সব দিকগুলো বিবেচনায় আনার পক্ষে ছিল। বিভিন্নমুখী আলাপ আলোচনার পর শেষ অবধি একটি মোটামুটি সমঝোতামূলক আলোচ্যসূচি গৃহীত হয় যাতে আল আকসা মসজিদের দু:খজনক ঘটনা, জেরুজালেম পরিস্থিতি, অধিকৃত ভূখন্ড থেকে ইসরায়েলি সৈন্য প্রত্যাহার, ফিলিস্তিনি জনগণের জাতীয় অধিকার পুন:প্রতিষ্ঠা এবং তাদের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৫৩] এছাড়াও সম্মেলনে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক এবং পদ্ধতিগত বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়। যার মধ্যে ছিল–সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের দিনক্ষণ নির্ধারণ, মুসলিম দেশসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে ঐকমত্য এবং সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্মিলিত অবস্থান গ্রহণ।

---

৫০. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪।

৫১.হুয়ারি বুমেদিয়েন (১৯৩২-১৯৭৮), তিনি ১৯৬৫-১৯৭৬ পর্যন্ত আলজেরিয়ান রিভুলিউশনারী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং ১৯৭৬-১৯৭৮ পর্যন্ত আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বিস্তারিত: <www. Wikipedia.org/Hoeri Bumedien>

৫২. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

৫৩. নূর আহমেদ বাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনের চূড়ান্ত ঘোষণাপত্রে আল কুদস, ফিলিস্তিন এবং আরব-ইসরায়েল সংঘর্ষ সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে নিজস্ব অবস্থানকে স্পষ্ট করে। ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে ইসরায়েলি আগ্রাসনের কারণেই আল কুদস এবং জেরুজালেমে অবস্থিত পবিত্র ধর্মীয় স্থানগুলো হুমকির সম্মুখীন এবং শহরে অবারিত যাতায়াত ও পবিত্র স্থানগুলোর মর্যাদা রক্ষার্থে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার স্বার্থে জেরুজালেমকে জুন ১৯৬৭ এর পূর্ববর্তী অবস্থানে ফিরিয়ে নেয়ার দাবী জানানো হয়। সম্মেলনে জেরুজালেমকে ১৯৬৭ পূর্ববর্তী অবস্থানে ফিরিয়ে না নিয়ে ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের যে কোনো উদ্যোগকে সমর্থন না করা বিষয়ে মুসলিম দেশসমূহ ও জনগণের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। এছাড়াও অধিকৃত আরব ভূখন্ডসমূহে ইসরায়েলি অব্যাহত সামরিক উপস্থিতি এবং ইসরায়েল কর্তৃক জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের জেরুজালেম সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তের প্রতি কর্ণপাত না করার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গ ফিলিস্তিনি জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও অধিকার আদায়ের আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে।[৫৪] তারা শান্তির মূলনীতির বিষয়ে তাদের অঙ্গীকারের পুনরাবৃত্তি করলেও দাবি জানায় যে শান্তি হতে হবে সম্মান ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে মার্চ ১৯৭০ সালে সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে মুসলিম দেশগুলোর বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া সম্মেলনে পি এল ও-কে ফিলিস্তিনীদের মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দানকারী একমাত্র বৈধ সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি ও তার প্রতি সর্বসম্মত সমর্থন ব্যক্ত করা হয়।[৫৫]

এই সম্মেলন শেষে ২৭ সেপ্টেম্বর এক যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন লিবিয়া, পাকিস্তান, জর্ডান, আরব আমিরাত, ইরিত্রিয়া, শাদ, সিরিয়ার ভ্রাতৃ সংঘ, আল ফাতাহ এবং মরক্কোর ইসতিকলাল পার্টির প্রতিনিধিগণ। শীর্ষ সম্মেলন এমন এক সময়ে রাজনৈতিক ও মতাদর্শিক দিক থেকে দ্বিধাবিভক্ত মুসলিম দেশসমূহকে একটি নির্দিষ্ট ও সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের পথে একত্রিত করতে সমর্থ হয় যে সময়ে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের সম্ভাব্যতার বিষয়টি অকল্পনীয় ছিল। এটি মুসলিম বিশ্বে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওআইসি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করে এবং প্রথমবারের মত সর্বোচ্চ পর্যায়ে আল কুদস ও ফিলিস্তিন সংক্রান্ত একটি সম্মিলিত অবস্থান গ্রহণে সমর্থ হয়।[৫৬] বেশ কিছু মুসলিম দেশ এই সম্মেলন হইতে দূরে থাকে। এক্ষেত্রে সিরিয়া ও ইরাকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিরিয়া যোগ না দেয়ার কারণ মরক্কোর সাথে সিরিয়ার কূটনৈতিক

---

৫৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪।

৫৫. মোহাম্মদ রেজাউল করীম, *ফিলিস্তিন সমস্যার ক্রমবিবর্তন*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃ. ২৫৬।

৫৬. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক ছিল না। ইরাক সম্মেলনের ব্যাপারে কতগুলো শর্ত আরোপ করেছিল, সেই শর্তগুলো পূরণ হয় নাই। এই কারণে ইরাক সম্মেলনে যোগদান হইতে বিরত থাকে।[৫৭]

প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন

২৩-২৫ মার্চ, ১৯৭০ সালের জেদ্দায় ইতিহাসে প্রথম বারের মত মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিশ্বের ২৩টি মুসলিম দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ যোগদান করেন। এই সম্মেলনেই একটি সাধারণ সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা সদস্য দেশসমূহের মাঝে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করবে এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বিশেষ করে আল কুদস সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং নিয়মিত সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এর প্রস্তাবক ছিল পাকিস্তান।[৫৮] আরও সিদ্ধান্ত হয় যে জেরুজালেম দখলমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই সাধারণ সচিবালয়ের প্রধান কার্যালয় হবে জেদ্দায়।[৫৯] এতে মালয়েশিয়া প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমানকে দু বছরের জন্য সাধারণ সচিবালয়ের মহাসচিব মনোনীত করা হয়। এই সম্মেলনের আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল:[৬০]

১. পিএলওকে রাজনৈতিক, বৈষয়িক, নৈতিক সমর্থন দান ও মুসলিম রাজধানীগুলোতে পিএলও এর অফিস খোলার জন্য স্ব স্ব দেশের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. প্রতি বৎসর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন আয়োজনের ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন

১৯৭০ সালের ২৫-২৮ ডিসেম্বরে পাকিস্তানের করাচির স্টেট ব্যাংক ভবনের মার্বেল হলে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ওআইসির মহাসচিব হিসেবে টেংকু আবদুর রহমানের মনোনয়নকে অনুমোদন করা হয়।[৬১] ২৩টি সদস্য দেশের প্রতিনিধিবর্গের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি ইসলামি সম্মেলন সংস্থার প্রথম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে ফিলিস্তিন, আল কুদস, গিনির ওপর পর্তুগালের আগ্রাসন নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ওআইসির অবকাঠামো এবং প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সম্মেলন সাধারণ সচিবালয়ের প্রথম বাজেট

---

৫৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪।

৫৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

৫৯. Dr. Isam Salim Shanti, *The Journey of OIC: From Rabat 1969 to Dakar 2008 (40 year anniversary special report), the OIC Journal,* May - August 2009, Jeddah, Saudi Arab, p. 22.

৬০. মোহাম্মদ রেজাউল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

৬১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাব অনুমোদন করে[৬২] এবং পাকিস্তান প্রস্তাবিত বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পর্যালোচনা করে। তবে এ সম্মেলনে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সংস্থার সনদ প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি খসড়ার ওপরে আলোচনার সূচনা করা।[৬৩]

তৃতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন

২৯ ফেব্রুয়ারি-৪ মার্চ ১৯৭২ সালে, জেদ্দায় এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০টি দেশ এ সম্মেলনে যোগদান করে। ওআইসির গঠনের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই সম্মেলন। এই সম্মেলনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল ওআইসির খসড়া সনদ অনুমোদন।[৬৪] সনদ অনুমোদন ছাড়াও ওআইসির প্রথম অঙ্গসংগঠন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কিছু প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় আলোচিত হয় এই সম্মেলনে। আল কুদস ও ফিলিস্তিন ছাড়াও এ সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আফ্রিকান জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম, ফিলিপাইনের মুসলিম জনগোষ্ঠী ও ভারত-পাকিস্তানের সীমান্ত পরিস্থিতির ন্যায় রাজনৈতিক বিষয়াবলিও আলোচিত হয়। পাকিস্তান প্রস্তাবিত বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সম্মেলনে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলেও মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক বিষয়াবলি ও ইসলামি ব্যাংক সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা ও দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে সচিবালয়ে একটি অর্থনৈতিক বিভাগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বলা হয় যে এ বিভাগ মুসলিম বিশ্বের আর্থিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বিশেষায়িত অস্তিত্ব হিসেবে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে। মুসলিম বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এই সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী বার্তা সংস্থা, শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি ইসলামি সাংস্কৃতিক গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন

১৯৭৩-এর আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ মুসলিম দেশসমূহের মাঝে সহযোগিতা বৃদ্ধির পথকে আরও প্রশস্ত করে তোলে। এ যুদ্ধের ফলে আঞ্চলিক শক্তি ভারসাম্যের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এবং আঞ্চলিক দেশসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মেরুকরণের সূচনা হয়। বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলো নিজস্ব মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক পার্থক্যের বিষয়গুলো ছোট করে দেখে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে জোর দিতে শুরু করে। যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় মিসর ও সৌদি আরব, সিরিয়া ও জর্ডান, ইরান ও ইরাকের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়নের মাঝে। এছাড়াও একাত্মতা প্রকাশ

---

৬২. সাধারণ সচিবালয়ের ব্যয় বহনের জন্য ৪ লক্ষ ৫০ হাজার ডলারের একটি তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। সূত্র: ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

৬৩. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৬৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

করতে বেশিরভাগ আফ্রিকান দেশগুলোর যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে।[৬৫]

এ পরিস্থিতিতে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন। ৩৭টি মুসলিম দেশ এই শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করে। সম্মেলনটি বলা যায় ফিলিস্তিন প্রশ্নে উৎসর্গীত ছিল। দশ দফা লাহোর ঘোষণার দশটি দফাই ছিল ফিলিস্তিন ও আল কুদস সম্পর্কিত।[৬৬] ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম সংক্রান্ত বিষয়াবলির পাশাপাশি এ শীর্ষ সম্মেলনে সদস্য দেশসমূহের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। ৩৪টি মুসলিম দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করে। বাংলাদেশ এই সম্মেলনে ওআইসির সদস্য পদ লাভ করে।[৬৭] ফিলিস্তিন সংক্রান্ত বিষয়ে দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন ফিলিস্তিনি জনগণের সংগ্রামের প্রতি ওআইসির দৃঢ় সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে এবং ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা বা পিএলওকে ফিলিস্তিনি জনগণের একমাত্র বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টিকে নিশ্চিত করে। এ প্রসঙ্গে যেসব দেশে তখনও পিএলও দফতর খোলা হয়নি, সেসব দেশকে পিএলও দফতর খোলার লক্ষ্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের সুপারিশ করে।

---

৬৫. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৬৬. মোহাম্মদ রেজাউল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

৬৭. প্রথমে বাংলাদেশ সম্মেলনে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। কারণ তখনও পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নাই। বাংলাদেশ সুস্পষ্ট ভাষায় এই অভিমত ব্যক্ত করে যে, পাকিস্তান বাংলাদেশের বাস্তবতা স্বীকার না করিলে বাংলাদেশ পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করিতে পারে না। বাংলাদেশ ৩ ফেব্রুয়ারি এই ঘোষণা প্রদান করে। এই ঘোষণার ৪৮ ঘন্টা পর অর্থাৎ ৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন ওআইসি মহাসচিব আত তুহামী ঝটিকা সফরে কায়রো হতে ঢাকায় আসেন এবং বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানান। জনাব তুহামী ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ত্যাগ করেন এবং বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি বাংলাদেশের অংশগ্রহণের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জনাব তুহামীর এই আমন্ত্রণ এবং সম্মেলনে বাংলাদেশের যোগদানের আশাবাদ পাকিস্তানের স্বীকৃতি ব্যতিরেকে ফলপ্রসূ হইতে পারে না। যখন স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, বাংলাদেশ যা বলেছে তা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সম্মেলনে যোগদান করিবে না, তখন ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের পক্ষ থেকে তৎকালীন কুয়েতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে সাত সদস্যের শুভেচ্ছা মিশন ২২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার রাতে লাহোর হইতে ঢাকায় আগমন করে। শিনে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের মহাসচিব সহ লেবানন ও সোমালিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আলজেরিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সেনেগাল ও পিএলও এর দুইজন প্রতিনিধি ছিলেন। রাত ১২.১৫ মিনিটে তারা বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৫০ মিনিট আলাপ আলোচনা করেন। পরে শুক্রবার অতি প্রত্যুষে ৩.১৫ মিনিটে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। এই বৈঠক ৬.১৫ মিনিট পর্যন্ত চলে। এই বৈঠক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রুপের চারজন সদস্য লাহোরে চলে যান। দলনেতাসহ তিনজন ঢাকায় থেকে যান। তারা লাহোরে ফিরে যাবার পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি দানের কথা ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের স্বীকৃতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার দ্বিতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২২ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়েরি বুমেদিনের প্রেরিত বিমানে লাহোরের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। বিস্তারিত: ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনের পুরো অংশ জুড়েই পারস্পরিক অবিশ্বাসের ভিত্তিতে সম্পর্কযুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সমঝোতার এক বাতাবরণ বিরাজ করছিল। ওআইসি এ ধরনের কিছু ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করে সদস্য দেশগুলোর সম্পর্কোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পারস্পরিক স্বীকৃতি প্রদান এবং জর্ডান কর্তৃক পিএলওকে ফিলিস্তিনি জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি।[৬৮] এ সম্মেলনের মাধ্যমে সংস্থাটির আলোচ্যসূচি আরও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। এ পর্যায়ে সংস্থাটি বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন বিস্তার ও সমমনা সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করে।

এ সময় অধিকাংশ সদস্য দেশই অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন ছিল। বিশেষ করে তেল ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এসব দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণেই মধ্যসত্তরের দশকে তেল রপ্তানিকারক দেশসমূহের মাঝে অনুন্নত দেশসমূহকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উল্লেখরযাগ্য কিছু আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ও উন্নয়ন তহবিল গঠনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই সম্মেলনেই ইসলামি ঐক্য, ইসলামি স্বার্থ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সংরক্ষণ, উৎসাহিতকরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামি সংহতি তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৬৯]

৭ম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন

১২-১৫ মে, ১৯৭৬ সালে ইস্তাম্বুলের আতাতুর্ক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৪১টি দেশ সম্মেলনে যোগদান করে। এই সম্মেলনে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও সামর্থ্য বিচার-বিশ্লেষণে সক্ষম এ ধরনের একটি বিশেষায়িত সংস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সদস্য দেশগুলো একমত হয়। ফলে আঙ্কারাভিত্তিক ইসলামি দেশসমূহের জন্য পরিসংখ্যান, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (SESRIC) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এছাড়াও সাধারণ ঐতিহ্যের ভিত্তিতে ওআইসি সদস্য দেশসমূহের মাঝে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্মেলনে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তুরস্কের প্রতিনিধিদলের প্রস্তাবনা অনুযায়ী ইস্তাম্বুলভিত্তিক ইসলামি ইতিহাস, সংস্কৃতি ও চিত্রকলা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এ সম্মেলনে। এ সম্মেলনে জেরুজালেম ও ইসরাইল প্রভৃতি শহরের আরব জনগণকে সাহায্য করার জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠন অনুমোদন করে। এছাড়া মাসজিদুল আকসা, দখলিকৃত আরব এলাকা ইহুদীদের কবল মুক্তকরণ, জেরুজালেম শহর হইতে ইহুদীদের বহিষ্কার সংক্রান্ত বিষয়ে

---

৬৮. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৬৯. <http:// www.oic-oci.org/english/conf/is/2/2nd-is-sum.htm#1>.

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা করা হয়। কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে খিলাফত ব্যবস্থা বাতিল করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্র প্রদানের পর এই সম্মেলনই ছিল তুরস্কে অনুষ্ঠিত সর্ববৃহৎ ইসলামি সম্মেলন।[৭০]

তৃতীয় ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন

জানুয়ারি (২৫–২৮) ১৯৮১ সালে পবিত্র মক্কা মুকাররামা[৭১] এবং তায়েফ নগরীতে তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যের উপস্থিতি এবং ইসরাইলের সাথে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরের কারণে ১৯৭৮ সালের ৮ ডিসেম্বর মিসরকে এবং ১৯৮০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তানকে সম্মেলন হইতে বহিষ্কার করা হয়।[৭২] ইরাক এবং লিবিয়া সম্মেলনে যোগদান করে নাই। তখনকার ৪২টি মুসলিম দেশের মধ্যে বাকি ৩৮টি দেশ সম্মেলনে যোগদান করে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা ছাড়াও জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব ওয়াল্ড হেইম এই সম্মেলনে যোগদান করে।[৭৩] এই শীর্ষ সম্মেলনটি বাইতুল্লাহ শরীফে উদ্বোধন করা হয় এবং উদ্বোধন করেন সৌদি আরবের মরহুম বাদশাহ খালেদ। মসজিদুল হারামের চত্বরে কাবামুখী হয়ে দাঁড়ানো বাদশাহ ফয়সাল তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ঘোষণা করেন, "পূর্ব নয়, পশ্চিম নয়, আমাদের আনুগত্য খালেসভাবে ইসলামের প্রতিই"।[৭৪] এই সম্মেলনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফিলিস্তিন সংক্রান্ত কার্যাবলী তদারক ও সমন্বয় সাধনের জন্য একজন সহকারী মহাসচিবের পদ সৃজন এবং সাধারণ সচিবালয়ে ইসরায়েল বর্জন সংক্রান্ত একটি দফতর খোলা সেসব সিদ্ধান্তের অন্যতম।[৭৫]

---

৭০. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭।

৭১. মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের আল্লাহর ঘর কাবাকে সামনে রাখিয়া শপথ গ্রহণের সুবিধার্থে আল্লাহর ঘরে সম্মেলনের স্থান নির্ধারণ করা হয়। কাবা ঘরের দিকে মুখ করে উপবিষ্ট রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়। রাষ্ট্রপ্রধানদের সারিতে উপবিষ্ট কা'বামুখী বাদশাহ খালিদ তাঁহার আবেগ জড়ানো কণ্ঠের ভাষণে মহান আল্লাহর দরবারে ইসলামী বিশ্বের শান্তি, সংহতি ও বিজয়ের প্রার্থনা জানান। ভাষণের পর কা'বার ইমামের নেতৃত্বে রাষ্ট্রপ্রধানগণ সালাত আদায় করেন। অত:পর রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রতিনিধিগণ সম্মিলিতভাবে কা'বা তাওয়াফ করেন, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। শীর্ষ সম্মেলনের বিদায়ী বৈঠকে সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত করে রাষ্ট্রপ্রধানগণ পরস্পর বিদায় গ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে সকলে এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে সূরা ফাতিহা পাঠ করে আল্লাহর নিরংকুশ সার্বভৌমত্ব মেনে নেন এবং সিরাতুল মুস্তাকীমে চলার অঙ্গিকার করেন। বিস্তারিত: ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬-৩৬৭।

৭২. প্রায় ৫ বছর মিসরের সদস্য পদ স্থগিত থাকার পর ১৯ জানুয়ারি ১৯৮৪ সালে কাসাব্লাঙ্কায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে মিসর আবার সদস্য পদ লাভ করে। বিস্তারিত: ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০।

৭৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬।

৭৪. মোহাম্মদ রেজাউল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

৭৫. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

Dhaka University Institutional Repository

ইসরায়েল-মিসর ক্যাম্প ডেভিড শান্তি চুক্তি, ইরান-ইরাক যুদ্ধ এবং আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসন ছিল সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয়। মুসলিম বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ইরান-ইরাক যুদ্ধের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে যুদ্ধরত উভয় পক্ষকে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে যুদ্ধ অবসানের আহবান জানান। আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মুসলিম বিশ্ব থেকে একটি সমন্বিত ও কড়া অবস্থান গ্রহণের আহবান জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে সোভিয়েত সৈন্য অপসারণের আহবান জানিয়ে মহাসচিব ও গিনি, পাকিস্তান, ইরান ও তিউনিশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সমন্বয়ে আফগানিস্তান সংক্রান্ত মন্ত্রী পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলনে কমিটিকে আলোচনার মাধ্যমে একটি সমাধানে পৌঁছাবার লক্ষ্যে জাতিসংঘের মহাসচিবের সাথে সহযোগিতার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। বিশেষ করে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈষম্যের কারণে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থানের ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের বিষয়টিকে ভিত্তি করে ধরে নেয়া হয় যে সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক সহযোগিতা একটি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পারস্পরিক একতা বৃদ্ধির একটি কার্যকরী কৌশল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।[৭৬] এ প্রেক্ষিতে সম্মেলনে এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই শীর্ষ সম্মেলনে "সদস্য দেশসমূহের অর্থনৈতিক সহযোগিতা সুদৃঢ়করণ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা" অনুমোদিত হয়। সম্মেলনে সাধারণ সচিবালয়কে কর্মপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনাও দেয়া হয়। এর অধীনে ১০টি অগ্রাধিকারভিত্তিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। সেগুলো হল খাদ্য ও কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, পরিবহন, যোগাযোগ ও পর্যটন, অর্থনৈতিক ও আর্থিক খাত, জ্বালানি ও শক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানব সম্পদ ও সামাজিক বিষয়াবলি, জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য এবং কারিগরি সহায়তা। এক্ষেত্রে একটি নতুন বাস্তবায়ন কৌশলও প্রণীত হয়। এছাড়া এ সম্মেলনে মরক্কোভিত্তিক ইসলামি উন্নয়ন ও বাণিজ্য কেন্দ্র (ICDT) স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়।

ওআইসির ইতিহাসে এ সম্মেলনকে স্মরণ করা হয় এর স্থায়ী কমিটিসমূহ ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের স্রষ্টা হিসেবে। এ সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানদের নেতৃত্বে তিনটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়:[৭৭]

১. অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি (COMCEC)
২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি (COMSTECH)
৩. তথ্য ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি (COMIAC)।

---

[৭৬]. <http://www.oic-oci.org/english/conf/is/3/3rd-is-sum(economical).htm.>

[৭৭]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্মেলনে ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিভিন্ন পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফিকহ অ্যাকাডেমি (International Islamic Fiqh Academy-IIFA) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই অ্যাকাডেমির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে প্রকৃত ইসলামি সংস্কৃতির ভিত্তিতে ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন পরিবর্তনকে বিবেচনায় রেখে কার্যকরী "ইজতেহাদ" এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যাবলির বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহজ সমাধান প্রদান।[৭৮] এই সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামিক আদালত স্থাপনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। এই আদালতের বিধিমালা নির্ধারণের লক্ষ্যে সদস্য দেশসমূহের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

এই সম্মেলনে মক্কা ঘোষণা গৃহীত হয়। এই ঘোষণায় পারস্পরিক সংহতি জোরদার করার মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহের যে কোনো মতভিন্নতা সমাধানের জন্য ভ্রাতৃত্ববোধ, একতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার নীতি ও বিভিন্ন সনদের ওপর ভিত্তি করে শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বনের ওপরে জোর দেয়া হয়। এ ঘোষণা ফিলিস্তিনিদের জাতীয় অধিকার আদায়ের সংগ্রামের সাথে মুসলিম উম্মাহর একাত্মতা ঘোষণা করে। এছাড়াও এ ঘোষণায় দুই বিশ্ব শক্তির পারস্পরিক বৈরিতা বৃদ্ধি, প্রভাব বলয় বিস্তারের প্রতিযোগিতা এবং মুসলিম বিশ্ব সংলগ্ন এলাকাসমূহে যেমন ভারত মহাসাগর, আরব সাগর, লোহিত সাগর ও উপসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক অবস্থান সংহতকরণের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এ ঘোষণায় মুসলিম বিশ্বের দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। ওআইসি যাতে দক্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার করা হয় মক্কা ঘোষণায়।[৭৯]

ত্রয়োদশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন

১৯৮২ সালে নিয়ামেতে ১৩তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে 'ওআইসি পুনর্গঠন' নামে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সময়ে ওআইসর কাঠামোর মাঝে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও কেন্দ্রগুলো তাদের দায়িত্ব পালনে কিছু উন্নতি লাভ করলেও, পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য বৃহত্তর পর্যায়ে পারস্পরিক সমন্বয় নিশ্চিত করা ও কর্মসম্পাদনের সাথে বাধা এরূপ যে কোনো প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সম্মেলনে পরবর্তীতে ওআইসির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত সব অঙ্গসংগঠনসমূহ, প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রগুলোর কার্যাবলী তদারকের জন্য মহাসচিবের তত্ত্বাবধানে একটি সরকারি পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের আহবান জানানো হয়। এর প্রেক্ষিতে ১৯৮৩ সালে বিশেষজ্ঞ দলটি জেদ্দায় মিলিত হয় এবং

---

৭৮. <http://www.oic-oci.org/english/conf/is/3/3rd-is-sum(cultural).htm.>

৭৯. <http://www.oic-oci.org/english/conf/is/3/3rd-is-sum.htm.>

Dhaka University Institutional Repository

ওআইসির অঙ্গসংগঠনগুলোর কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের পর তাদের কর্মকান্ডের মাঝে সমন্বয় সাধনের উপায়, সকল প্রকার পুনরাবৃত্তি দূরীকরণ ও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সুপারিশমালা সমৃদ্ধ একটি দিকনির্দেশনা প্রদান করে।[৮০]

চতুর্দশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন

৬-১০ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ সালে ঢাকার শেরে বাংলা নগরের বিশাল সংসদ ভবনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ৪১টি দেশের প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে উপসাগরীয় যুদ্ধের বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়।[৮১] এছাড়া আফগান সমস্যা, প্যালেস্টাইন ও মধ্যপ্রাচ্য, আল কুদস কমিটি (আল কুদস তহবিল ও ওয়াকফ), ইসরাইল বয়কট, ইসলামিক ব্যুরো, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, নামিবিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিকামী জনগণকে সমর্থন দান, ইসলামী দেশসমূহের নিরাপত্তা ও সংহতি, দক্ষিণ ফিলিপাইনের মুসলমানদের সমস্যা, ওআইসি এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের মধ্যে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।[৮২] সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ আরব দেশ মিসরকে এ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির কারণে। এই সম্মেলন চলাকালীন সময়ে পি এল ও নেতা ইয়াসির আরাফাত তাঁর অনুগত ৪ হাজার ফিলিস্তিনি গেরিলা মুক্তিযোদ্ধাসহ লেবাননের ত্রিপলীতে সিরীয় বাহিনীর দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন।[৮৩]

চতুর্থ ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন

১৬-২০ জানুয়ারি, ১৯৮৪ সালে মরক্কোর বন্দরনগরী কাসাব্লাঙ্কায় চতুর্থ ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৪২টি দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করে। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট লে: জেনারেল এইচ. এম এরশাদ ইসলামি দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা জোরদার ও সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে এ সম্মেলনে ১১ দফা কর্মসূচি পেশ করেন। কর্মসূচিগুলোর মধ্যে রয়েছে ফিলিস্তিন প্রশ্নে বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ ও সংঘাত নিরসনে একটা মধ্যস্থতা কমিশন গঠন এবং ইসলামি বিশ্ব বা মুসলিম দেশের কোনরূপ জরুরী পরিস্থিতি বা হুমকি সৃষ্টি হলে তার প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য একটা স্থায়ী কমিটি গঠন।[৮৪] এছাড়া ইরান-ইরাক যুদ্ধ প্রসঙ্গে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে উভয় দেশকে তাদের

---

৮০. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১।

৮১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯।

৮২. ইয়াহইয়া আরমাজানী, প্রাগুক্ত, পৃ. পঁচিশ-ছাব্বিশ।

৮৩. মোহাম্মদ রেজাউল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

৮৪. মোহাম্মদ রেজাউল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

নিজ নিজ সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের আহবান জানানো হয়। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে অধিকৃত সকল আরব এলাকা হইতে ইসরায়েলি সৈন্য প্রত্যাহারই মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানের মৌলিক শর্ত বলে উল্লেখ করা হয় এবং পশ্চিম তীর ও গাজায় ইসরায়েলি আইনসমূহ প্রত্যাখ্যান করা হয়।[৮৫]

১৮তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন

ওআইসির কাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালে রিয়াদে। এ সম্মেলনে পরবর্তী দশকগুলোতে ওআইসি এবং এর অঙ্গসংগঠন ও সহযোগী সংস্থাগুলোর কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ বিধিমালা নির্ধারণ করা হয়, যা সংস্থাটির গঠন প্রক্রিয়ায় এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এ সম্মেলনে মহাসচিবকে এক বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হয় যার অধীনে তিনি মক্কা ঘোষণা এবং তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনার আলোকে "যৌথ ইসলামি কার্যক্রম" পরিচালনাকল্পে একটি সার্বিক কর্মকৌশল তৈরি করে বিভিন্ন পন্থা ও উপায় বিশ্লেষণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এই পদক্ষেপের আওতায় তিনি "যৌথ ইসলামি কার্যক্রম" এর সবক্ষেত্রে অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয়গুলো চিহ্নিত করে একটি প্রস্তাবনা পেশ করবেন যাতে বর্ণিত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাধারণ সচিবালয় এবং এর সহযোগী অঙ্গসংগঠনগুলোর যথাযথ কার্যপদ্ধতি বিবৃত হবে।[৮৬] ওআইসি মহাসচিবের ক্ষমতা এ সম্মেলনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয় এবং সাধারণ সচিবালয়ের উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কোনো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মহাসচিবকে ক্ষমতায়ন করা হয়।[৮৭] এছাড়াও এ সম্মেলনে বিভিন্ন ওআইসি সংস্থাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বেশ কিছু কাঠামোগত সংস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

---

৮৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১।

৮৬.<http://www.oic-oci.org/english/conf/fm/18/18%20icfm-admin-en.htm#RESOLUTION%20No.%206/18-AF >

৮৭. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

ওআইসির সদস্য দেশ

জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি সদস্য নিয়ে গঠিত ৫৭ সদস্য বিশিষ্ট ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা জাতিসংঘে তাদের প্রতিনিধিত্ব করে। ওআইসির সদস্য দেশগুলো বিশ্বের এক-ষষ্ঠমাংশ ভৌগোলিক এলাকা ধারণ করে। বেশিরভাগ সদস্য দেশেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলিম হলেও ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত কোনো ধর্ম নয়।[৮৮] সুতরাং ওআইসির সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়টি একটি যোগসূত্র হিসেবে কাজ করলেও মূলত তারা নিজস্ব সার্বভৌম অধিকারের ভিত্তিতেই সংগঠনটিতে সদস্য পদ লাভ করে। এছাড়া সদস্য দেশগুলো ভৌগোলিকভাবে আফ্রিকা, আরব, এশিয়া, ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার আওতাভুক্ত হওয়ায় সংস্থাটি এক বিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক অবস্থানের সমন্বিত সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত হয়।

ওআইসির সদস্য এবং পর্যবেক্ষক দেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

ওআইসি সদস্য দেশগুলোর ভৌগোলিক বিন্যাস অনুযায়ী ২৭টি আফ্রিকা, ২৬টি এশিয়া, ২টি ইউরোপ, ও বাকী ২টি ল্যাটিন আমেরিকা মহাদেশে। রাবাতে অনুষ্ঠিত ১ম শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা ছিল ২৫টি। যার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন ২২ মে ১৯৯০ সালে একত্রিত হয় এবং বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করে স্বতন্ত্র জাতিরাষ্ট্রের মর্যাদা পায়।[৮৯]

- প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যান্য সদস্য দেশসমূহ:

১৯৬৯ সালের প্রারম্ভিকে যে দেশগুলি এই সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয় তাদের মধ্যে রয়েছে– আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, শাদ, মিসর, গিনি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন,

---

৮৮. ৪টি দেশে ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ধর্ম- পাকিস্তান, ইরান, আফগানিস্তান ও মৌরিতানিয়া।

৮৯. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালি, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, নাইজার, পাকিস্তান, প্যালেস্টাইন, ইয়েমেন, সৌদি আরব, সেনেগাল, সুদান, সোমালিয়া, তিউনিসিয়া ও তুরস্ক।

১ম শীর্ষ সম্মেলনের পর ওআইসি এর সদস্য সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭০ সালে ৫টি দেশ (বাহরাইন, কাতার, ওমান, সিরিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত) সংস্থায় যোগ দেয়। ১৯৭২ সালে যোগ দেয় সিয়েরালিওন। ১৯৭৪ সালে যোগ দেয় ৫টি দেশ (বাংলাদেশ, গ্যাবন, গিনি বিসাউ, উগান্ডা ও গাম্বিয়া)। ১৯৭৫ সালে বুরকিনা ফাসো ও ক্যামেরুন সংস্থায় যোগদান করে। ১৯৭৬ সালে ইরাক ও মালদ্বীপ যোগ দিলে সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০। সত্তর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ওআইসিতে আরো যোগ দেয় কমোরস (১৯৭৬) এবং জিবুতি (১৯৭৮)। পরবর্তী দশকে আসে আরও ৩টি দেশ-বেনিন (১৯৮২), ব্রুনাই দারুসসালাম (১৯৮৪) এবং নাইজেরিয়া (১৯৮৬)। আশির দশকের শেষে ওআইসির সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫। ৯০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভক্তির ফলে মধ্য এশিয়ার নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোর যোগদানের মাধ্যমে ওআইসি এর সদস্য সংখ্যা বেড়ে যায়। আজারবাইজান (১৯৯১) সালে, আলবেনিয়া, কিরগিজিস্তান,তাজিকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান (১৯৯২) সালে, মোজাম্বিক (১৯৯৪) সালে, কাজাখস্তান ও উজবেকিস্তান (১৯৯৫) সালে, সুরিনাম (১৯৯৬) সালে, টোগো (১৯৯৭) সালে, গায়ানা (১৯৯৮) সালে এবং সর্বশেষ আইভরিকোস্ট (২০০১) সালে সংস্থায় যোগদান করে।[৯০]

ভারত তার ১৩৫ মিলিয়ন মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে ওআইসি এর সদস্যভুক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করলেও পাকিস্তানের বিরোধিতার কারণে তা এখনো সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। পাকিস্তানের বক্তব্য: ভারত যদি কাশ্মীরের দখলদারিত্ব ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে অবজারভার/পর্যবেক্ষক মর্যাদা দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য যে ওআইসি এর বৈদেশিক নীতিতে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়।[৯১] সিরিয়ার সাধারণ নাগরিকের ওপর নির্যাতনের অজুহাতে আগস্ট ২০১২ সালে সিরিয়াকে ওআইসি, এর অধীনস্থ, বিশেষায়িত এবং সহযোগী কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।[৯২]

---

৯০. এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭-৪৯৮।

৯১. প্রাগুক্ত।

৯২. *The Europa World Year Book* (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group-2013), p. 413.

Dhaka University Institutional Repository

- পর্যবেক্ষক দেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ:

ওআইসির পর্যবেক্ষক মর্যাদা পাওয়া দেশগুলো হলো:[৯৩]

ক্রমিক নং	দেশ	যোগদানের বছর
১.	উত্তর সাইপ্রাস	১৯৭৯
২.	বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা	১৯৯৪
৩.	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	১৯৯৭
৪.	থাইল্যান্ড	১৯৯৮
৫.	রাশিয়া	২০০৫

- পর্যবেক্ষক ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	যোগদানের বছর
১.	ওআইসি পার্লামেন্টারীর ইউনিয়ন	২০০০
২.	ওআইসি ইয়ূথ ফোরাম	২০০৫

- পর্যবেক্ষক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ:[৯৪]

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠান	যোগদানের বছর
১.	আরব লীগ	১৯৭৫
২.	জাতিসংঘ	১৯৭৬
৩.	ন্যাম	১৯৭৭
৪.	আফ্রিকান ইউনিয়ন	১৯৭৭
৫.	অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (ECO)	১৯৯৫

- অবজারভার/পর্যবেক্ষক হিসেবে স্বীকৃত সংস্থা ও সম্প্রদায় হল ফিলিপাইনের মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (১৯৭৭)।[৯৫]

[৯৩]. এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৮।

[৯৪]. প্রাগুক্ত।

[৯৫]. The Europa World Year Book 2013, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পরিচ্ছেদ

ওআইসির সাংগঠনিক কাঠামো

ইসলামি সম্মেলন সংস্থা বা ওআইসি কেবল মুসলমানদের সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে গঠিত কূটনৈতিক মঞ্চ নয়। বরং মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে সংস্থাটি কাজ করে। এছাড়া সংঘাত নিরসন, সদস্য নয় এমন সুবিধাবঞ্চিত মুসলিম গোষ্ঠীকে সহায়তা করা এবং সংলাপ ও বিশ্ববাসীর মাঝে সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে–এসব বিষয়ের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে ওআইসি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রাথমিকভাবে ওআইসির সাধারণ সচিবালয় একটি ছোট দফতর এবং সভা ও সম্মেলনসমূহ অনুষ্ঠানের জন্য কিছু দিক নির্দেশনা নিয়ে যাত্রা শুরু করে।

১৯৮১ সালের ৩য় শীর্ষ সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মাঝে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করার দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে সাধারণ সচিবালয়ের কর্মপরিধি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। একই সম্মেলনে ৩টি স্থায়ী কমিটি ও বেশ কয়েকটি সহযোগী সংস্থার প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষায়িত ও সংযোজিত সংস্থাসমূহের সাথে যৌথ ইসলামী কার্যক্রম এর অধীনে কাজ করার মাধ্যমে সাধারণ সচিবালয়ের কাঠামোকে আরও বিস্তৃত করে তোলে।

ওআইসি সনদের এই সংস্থার কাঠামো সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি প্রধান তিনটি অঙ্গে বিভক্ত থেকে কাজ করবে-

- **ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন:**

ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশসমূহের রাজা বা সরকারপ্রধান/রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে গঠিত ওআইসির সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হলো ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন। সম্মেলনে রাজা ও সরকার প্রধানবৃন্দ অংশগ্রহণ করে থাকেন।[৯৬] ইসলামি দেশসমূহ তথা মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন বিষয়াবলিসহ ওআইসির সনদ কার্যকরণে, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে এবং সাধারণ সচিবালয় গৃহীত বিভিন্ন নীতি

---

৯৬. এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন ভূমিকা পালন করে থাকে। ওআইসি সনদ অধ্যায়-৪, ধারা-৮ এ ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনের নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে–

১. ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন প্রতি ৩ বছর পর পর সদস্যভুক্ত যেকোনো দেশের রাজধানী বা গুরুত্বপূর্ণ শহরে অনুষ্ঠিত হবে।

২. শীর্ষ সম্মেলনের এজেন্ডাসহ সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সাধারণ সচিবালয়ের সহযোগিতায় ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে।

৩. পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সুপারিশের মাধ্যমে অথবা যেকোনো সদস্য দেশ কিংবা মহাসচিবের উদ্যোগের মাধ্যমে এবং সদস্য দেশসমূহের সমর্থনের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা যেতে পারে।

এ পর্যন্ত মোট ১২টি ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। যার সর্বশেষটি (১২তম) অনুষ্ঠিত হয়েছে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে মিসরের কায়রোতে। ১৩তম ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ২০১৬ সালে তুরস্কে।[৯৭]

- পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন:

শীর্ষ সম্মেলন এর একটি উপ কমিটি হলো পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন। এই সম্মেলনে পূর্ববর্তী বৈঠকের কার্যবিবরণী এবং মুসলিম দেশগুলোর সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। ওআইসি সনদ অধ্যায়-৪, ধারা-১০ এ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের নীতিমালা ও কার্যাবলী বর্ণিত হয়েছে–

১. পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন প্রতিবছর একবার ওআইসিভুক্ত যেকোনো দেশে অনুষ্ঠিত হবে।

২. অধিকাংশ সদস্য দেশ কর্তৃক অনুমোদিত বিশেষ প্রয়োজনে যেকোনো সদস্য দেশ কিংবা ওআইসি মহাসচিবের উদ্যোগের মাধ্যমে বিশেষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৩. পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সুপারিশের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহর সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রী পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে। এসব সভায় গৃহীত প্রতিবেদন ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন কিংবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে দাখিল করতে হবে।

৪. পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন নিম্নোক্ত বিধিমালার আলোকে ওআইসির সাধারণ নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে:

ক. ওআইসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

---

৯৭. *The Europa World Year Book 2013*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩।

Dhaka University Institutional Repository

খ. পূর্ববর্তী শীর্ষ সম্মেলন কিংবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

গ. সাধারণ সচিবালয় ও অঙ্গসংগঠন সমূহের কার্যক্রম, বাজেট এবং অন্যান্য আর্থিক ও প্রশাসনিক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং বিবেচনা করা;

ঘ. সদস্য দেশসমূহের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা;

ঙ. নতুন অঙ্গসংগঠন কিংবা কমিটি গঠনে সুপারিশ করা;

চ. ওআইসি সনদের ধারা ১৬ এবং ১৮ অনুযায়ী সংস্থাটির মহাসচিব এবং সহকারী মহাসচিব নির্বাচন করা;

ছ. সচিবালয় অনুমোদিত অন্যান্য যেকোনো ইস্যু বিবেচনা করা।

- সাধারণ সচিবালয়

সাধারণ সচিবালয় ওআইসির প্রধান কার্যনির্বাহী সংস্থা। এই সচিবালয় সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত। জেদ্দায় মক্কা রোডে অবস্থিত এই সচিবালয়টি সৌদি সুলতানের পূর্বতন প্রাসাদ। সৌদি আরবের বাদশাহ এই রাজপ্রাসাদ ওআইসিকে দান করেন।[৯৮] সাধারণ সচিবালয়ে ১১টি বিভাগ রয়েছে। এই সকল বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব মহাসচিবের চারজন সহকারীর ওপর। ওআইসি সনদের অধ্যায়-১১, ধারা-১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১-এ সাধারণ সচিবালয়ের গঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে-

❖ ধারা-১৬

সাধারণ সচিবালয়ে একজন মহাসচিব থাকবেন যিনি হবেন সংস্থাটির প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। এছাড়া প্রয়োজনমত সংস্থাটির অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ থাকবেন। মহাসচিব পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের মাধ্যমে ওআইসির ভৌগোলিক দল বিভক্তির ভিত্তিতে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন এবং মেয়াদ শেষে তা একবারই নবায়ন করা যাবে।

❖ ধারা-১৭

সংস্থাটির মহাসচিব নিম্নোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন-

✓ ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন ও অন্যান্য মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত, নীতিমালা ও সুপারিশ বাস্তবায়নে তদারকি করেন;

✓ সংস্থাটির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের কার্যাবলির মাঝে সমন্বয় সাধন করেন;

✓ সাধারণ সচিবালয়ের বাজেট ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন;

---

৯৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

- ✓ সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার দুরত্ব কমাতে বিভিন্ন ইস্যুতে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন;
- ✓ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে সংস্থাটির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান করেন;
- ✓ শীর্ষ সম্মেলন কিংবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের মাধ্যমে অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেন।

❖ ধারা–১৮

১. ওআইসি মহাসচিব পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে একজন সহকারী মহাসচিব নিয়োগের লক্ষ্যে নমিনেশন প্রদান করেন, যার মেয়াদ হবে ৫ বছর;

২. শীর্ষ সম্মেলন কিংবা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশমালা বাস্তবায়নে মহাসচিব একজন বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন। তবে এ ধরনের নিয়োগের ক্ষেত্রে অবশ্যই পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে;

৩. মহাসচিব সদস্য দেশের মধ্য থেকে যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সাধারণ সচিবালয়ের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারেন। এছাড়া তিনি খন্ডকালীন ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শকও নিয়োগ দিতে পারেন।

❖ ধারা–১৯

মহাসচিব, সহকারী মহাসচিব এবং সাধারণ সবিালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ তাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সংস্থাটি ব্যতীত কোনো দেশ বা কর্তৃপক্ষের কোন ধরনের নির্দেশনা গ্রহণ করবে না। তারা এমন ধরনের কর্মকান্ড থেকে মুক্ত থাকবেন যা তাদের পদ বা পদবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

❖ ধারা–২০

সাধারণ সচিবালয় স্বাগতিক/আয়োজিত দেশের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে শীর্ষ সম্মেলন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের আয়োজন করবে।

❖ ধারা–২১

আল কুদস তথা জেরুজালেম শহর মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সংস্থাটির/সাধারণ সচিবালয়ের সদর দফতর হবে জেদ্দায়। জেরুজালেম মুক্ত হলে তা সংস্থাটির স্থায়ী সদর দফতর হিসেবে বিবেচিত হবে।

ওআইসি সাধারণ সচিবালয়ে ১১টি বিভাগ রয়েছে যেগুলো পরিচালনা করার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে মহাসচিবের চারজন সহকারীর উপর। এর মধ্যে রাজনীতি বিষয়ক সহকারীর অধীনে আছে রাজনৈতিক, ইসলামি সংখ্যালঘু এবং তথ্য বিভাগসমূহ। আল কুদস এবং ফিলিস্তিন বিষয়ক

Dhaka University Institutional Repository

সহকারীর অধীনে আছে পবিত্র কুদস, ফিলিস্তিন সমস্যা এবং বৈধতা বিষয়ক বিভাগগুলো দেখাশুনা করার। আর সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং ইসলামি সংহতি তহবিল বিষয়ক সহকারী পরিচালনা করেন সংস্কৃতি, ইসলামি সংহতি তহবিল, হিজরী এবং নিউইয়র্ক অফিসবিষয়ক বিভাগসমূহ।[৯৯]

❖ ওআইসির মহাসচিববৃন্দ: [১০০]

ইং	ইাম	দেশ	সাল
১.	টেংকু আবদুর রাহমান	মালয়েশিয়া	১৯৭১-১৯৭৩
২.	হাসান আল তুহামী	মিসর	১৯৭৪-১৯৭৫
৩.	ড. আমাদু কারীম গায়ে	সেনেগাল	১৯৭৫-১৯৭৯
৪.	হাবিব শাত্তী	তিউরিশিয়া	১৯৭৯-১৯৮৪
৫.	শারীফুদ্দীন পীরযাদা	পাকিস্তান	১৯৮৫-১৯৮৮
৬.	ড. হামিদ আল যাবিদ	নাইজার	১৯৮৯-১৯৯৬
৭.	ড. আযেদ্দিন লারাকি	মরক্কো	১৯৯৭-২০০০
৮.	ড. আবদেল ওয়াহিদ বেলকেযিয	মরক্কো	২০০১-২০০৪
৯.	ড. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু	তুরস্ক	২০০৫-২০১৩
১০.	আইয়াদ বিন আমিন মাদানী	সৌদি আরব	২০১৪-বর্তমান

- স্থায়ী কমিটিসমূহ:

ওআইসির কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন এবং গতিশীলতা আনয়নের পাশাপাশি সদস্য দেশগুলোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটিগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১. আল কুদস (জেরুজালেম) কমিটি:

১৯৭৫ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে মরক্কোভিত্তিক "আল কুদস কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এর মাধ্যমে ওআইসির অস্তিত্বে আল কুদস সংক্রান্ত বিষয়াবলির সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। মরক্কোর বাদশাহ দ্বিতীয় হাসান এই কমিটির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১০১] এটি জেরুজালেম

---

[৯৯]. অগ্রপথিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

[১০০]. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩ এবং *The Europa World Year Book*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩।

[১০১]. বর্তমান সভাপতি মরক্কোর রাজা ষষ্ঠ মুহাম্মদ। সূত্র: *The Europa World Year Book 2013*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩।

Dhaka University Institutional Repository

অবমুক্তকরণ, মুসলমানদের অধিকার সম্পর্কে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ, ইসরাইলের আগ্রাসন এবং জেরুজালেম ও ফিলিস্তিন সংক্রান্ত ওআইসি নীতিমালা বাস্তবায়নে কাজ করে থাকে। এ লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে আল কুদস ফান্ড গঠন করা হয়েছে যা ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করে থাকে।[১০২]

এছাড়া ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত ৩টি স্থায়ী কমিটি হলো-[১০৩]

২. তথ্য ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি:

জানুয়ারি ১৯৮৩ সালে সেনেগালের ডাকারে তথ্য ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির (Standing Committee on Information and Cultural Affairs-COMIAC) প্রথম সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার কার্যক্রম শুরু হয় এবং সেনেগাল এর সভাপতির পদ লাভ করে।

৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি:

১৯৮৩ সালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির (Standing Committee on Scientific and Technological Cooperation-COMSTECH) কার্যক্রম শুরু হয় এবং পাকিস্তান এর সভাপতির পদ লাভ করে।

৪. অর্থ ও বাণিজ্য সহযোগিতা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি:

১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত ৩য় শীর্ষ সম্মেলনে কোনো আরব দেশ অর্থ ও বাণিজ্য সহযোগিতা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির (Standing Committee on Economic and Trade Cooperation-COMCEC) সভাপতির পদ গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ না করায় পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলন পর্যন্ত বিষয়টি ঝুলে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে ৪র্থ শীর্ষ সম্মেলনে তুরস্ক এর সভাপতি পদ গ্রহণে সম্মেলনের সম্মতি অর্জন করে এবং নভেম্বর ১৯৮৪ সালে ইস্তাম্বুলে কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার কার্যক্রম শুরু করে।

এদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে স্ব স্ব ক্ষেত্রে মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবনা ও সিদ্ধান্তসমূহের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সহযোগিতার বিভিন্ন পন্থা ও উপায় বের করা।[১০৪]

---

[১০২]. John L. Esposito, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

[১০৩]. একমেলেদ্দি ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

[১০৪].The main functions of these committees are to monitor the implemention of resolutions passed by the OIC, to study means of strengthening co-operation among Muslim states, to draw up programs and submit proposals designed to increase member states capacity in the fields indicated, and to study agenda items and submits draft resolutions before summit meetings and meetings of foreign ministers. বিস্তারিত: John L. Esposito, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রেক্ষিতে ৩য় শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্বে স্থায়ী কমিটিগুলোর জন্য ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচন বিষয়ে বিস্তারিত বিধিমালা প্রণীত হয়। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি কমিটি হবে ১০ সদস্য বিশিষ্ট এবং একজন রাষ্ট্রপ্রধান সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়াও এ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে সদস্যবর্গ ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে কুয়েতে অনুষ্ঠিত ৫ম শীর্ষ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ওআইসির সব সদস্য দেশই এসব কমিটির সদস্য পদ লাভ করবে।[১০৫] সদস্য দেশগুলোর কৌশলগত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়াবলিতে স্থায়ী কমিটিগুলো কিছু প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে চলছে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টিকে আরও সুদৃঢ় করার পন্থা ও উপায় সন্ধানের উদ্দেশ্যে নিরলসভাবে এই কমিটিগুলো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া অন্যান্য কমিটিগুলো হচ্ছে–[১০৬]

৫. ইসলামী শান্তি কমিটি
৬. স্থায়ী অর্থ কমিটি
৭. ইসলামী সংহতি কমিটি
৮. ফিলিপাইনের মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কিত আট সদস্য বিশিষ্ট কমিটি
৯. ফিলিস্তিন সংক্রান্ত ছয় সদস্য বিশিষ্ট কমিটি

- **ইসলামী আন্তর্জাতিক আদালত:**

৩য় শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার যে কোন ধরনের অপরাধমূলক কাজ পর্যবেক্ষণ এবং ওআইসি সনদের লঙ্ঘনমূলক তৎপরতা পরীক্ষা করে দেখা এই আদালতের কাজ।[১০৭]

- **বাজেট:**

সদস্য দেশগুলোর বাধ্যতামূলক ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবামূলক অনুদান থেকে ওআইসির বাজেট ঘোষিত হয়। অন্যান্য সংস্থার তুলনায় এ বাজেটের পরিমাণ খুবই কম। এছাড়া সব সদস্য দেশ তাদের নির্ধারিত বাধ্যতামূলক অনুদান পরিশোধ করেন না। তবে তাদের সংখ্যা কমে আসছে। আগে যেখানে ২১টি দেশ কখনো তাদের নির্ধারিত অনুদান প্রদান করতেন না সেখানে ২০০৪/০৫ অর্থবছরে এই সংখ্যা ১২ তে নেমে এসেছে এবং নিয়মিত অনুদান প্রদানকারী দেশের সংখ্যা ২১ থেকে ২৫ এ উন্নীত হয়েছে। ২০০৪/০৫ অর্থবছরে ২৭টি দেশ তাদের বাধ্যতামূলক অনুদান

---

১০৫. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

১০৬. *The Europa World Year Book 2013*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩।

১০৭. অগ্রপথিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশোধ করেছে। কিন্তু ওআইসির কার্যক্রম বৃদ্ধির সাথে সাথে বাজেটের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাওয়ায় সাধারণ সচিবালয় বাজেট সংকটে পড়ে। ২০০৬/০৭ অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেটে ১০.০% বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০৬/০৭ অর্থবছরের বাজেট নির্ধারিত হয়েছে ১৭,৬০০,০০০ ইউএস ডলার।[১০৮] (বৃদ্ধির পরিমাণ ১,৬০০,০০০ ইউএস ডলার)

২০০৬/০৭ অর্থবছরে ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশগুলোর বাধ্যতামূলক অনুদানের পরিমান[১০৯] (শতাংশে)	
০.৫%	আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, বেনিন, বুরকিনা ফাসো, শাদ, কমোরোস, ক্যামেরুন, জিবুতি, গাম্বিয়া, গিনি, গিনি বিসাউ, গায়ানা, কিরগিজিস্তান, মালদ্বীপ, মালি, মৌরিতানিয়া, মোজাম্বিক, নাইজার, সিয়েরালিওন, সোমালিয়া, সুরিনাম, তাজিকিস্তান, টোগো, উগান্ডা ও ইয়েমেন।
১.০%	আজারবাইজান, বাহরাইন, বাংলাদেশ, গ্যাবন, আইভরিকোস্ট, জর্ডান, কাজাখস্তান, লেবানন, সেনেগাল, সুদান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান।
১.৫%	নাইজেরিয়া,সিরিয়া ও তিউনিশিয়া।
২.০%	মিসর. ইরাক, মরক্কো, ওমান ও পাকিস্তান।
৩.০%	আলজেরিয়া
৩.৫%	ব্রুনাই, ইন্দোনেশিয়া ও কাতার
৫.০%	মালয়েশিয়া ও তুরস্ক
৫.৫%	ইরান
৬.০%	লিবিয়া
৭.০%	সংযুক্ত আরব আমিরাত
৯.০%	কুয়েত
১০.০%	সৌদি আরব
বাদ	ফিলিস্তিন

[১০৮]. ১৩-১৫ মে ২০০৬, সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত ৩৪ তম স্থায়ী অর্থ কমিটির বৈঠকে তৎকালীন ওআইসি মহাসচিব একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু দেয়া ভাষণ। <http:// www.oic-oci.org>

[১০৯]. Resolution No. 3/33-AF on the New scale of Member States Mandatory Contributions to Annual Budgets of the General Secretariat and its Subsidiary Organs, 2006/07.

Dhaka University Institutional Repository

৫ম পরিচ্ছেদ

ওআইসির অঙ্গসংগঠনসমূহ[১১০]

❖ অধীনস্থ অঙ্গসংগঠনসমূহ (Subsidiary Organs)[১১১]

ওআইসির কাঠামোর আলোকে ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন বা ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এগুলো স্থাপিত হয়। ওআইসির সব সদস্য দেশই সরাসরি এসব অঙ্গসংগঠনের সদস্য হয়ে যাবে এবং তাদের বাজেট পরবর্তী সভার দ্বারা অনুমোদিত হবে।

- ইসলামি সংহতি তহবিল:
  ১৯৭৪ সালে লাহোরে গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এর প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৭৬ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এর সদর দফতর জেদ্দায়। এটি সদস্য দেশগুলোর মানবিক বিপর্যয়, শিক্ষার উন্নয়ন এবং বিভিন্ন গবেষণা, সভা-সেমিনার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

- ইসলামি দেশসমূহের পরিসংখ্যান, অর্থনৈতিক, সামাজিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:
  ১৯৭৮ সালে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর যাত্রা শুরু। এর সদর দফতর তুরস্কের আঙ্কারায়। এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে–সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বহি:অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

- ইসলামি ইতিহাস, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্র:
  ১৯৭৯ সালে ইসলামি সভ্যতা ও মুসলিম সংস্কৃতিকে জানার, বোঝার ও তুলে ধরার লক্ষ্যে এর কার্যক্রম শুরু। এর সদর দফতর তুরস্কের ইস্তাম্বুলে। সদস্য দেশসমূহের পারস্পরিক এবং সদস্য দেশসমূহের সাথে বহির্বিশ্বের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের উন্নয়ন এই কেন্দ্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

---

১১০. এখানে সংক্ষিপ্তাকারে অঙ্গসংগঠনগুলোর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১১১. *The Europa World Year Book 2013*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬।

Dhaka University Institutional Repository

- আন্তর্জাতিক ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমি:
  ১৯৮১ সালে মক্কা ও তায়েফে অনুষ্ঠিত তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে এর প্রতিষ্ঠা। এর সদর দফতর জেদ্দায়। এই অ্যাকাডেমির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে–নির্ভরযোগ্য তথ্যের আলোকে ইসলামি ফিকহ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা ও মতামত প্রদান করা।

- ইসলামি বাণিজ্য উন্নয়ন কেন্দ্র:
  ১৯৮১ সালে অনুমোদিত হলেও ১৯৮৩ সালে এব প্রকৃত কার্যক্রম শুরু হয়। এর সদর দফতর মরক্কোর ক্যাসাব্লাঙ্কায়। সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার আন্ত:বাণিজ্য বৃদ্ধিতে এটি সাহায্য করে থাকে।

- ইসলামি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়:
  ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠা, ২০০১ সালে নতুন নামকরণ করা হয় ইসলামি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে গাজীপুরে এর অবস্থান।

- নাইজার এবং উগান্ডাস্থ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ:
  ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৮৬ সালে নাইজার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৮৮ সালে উগান্ডা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সংস্থাগুলি বলা যায় সন্তোষজনকভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, এবং প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য হারে ট্রেনিং/ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীপ্রাপ্ত জনবল বেরিয়ে আসছে।[১১২]

❖ বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ (Specialised Institutions)[১১৩]

ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন বা ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওআইসির কাঠামোর আওতায় বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। ওআইসির সদস্য দেশগুলোই কেবল এসব প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পারে তবে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যপদ ঐচ্ছিক তথা বাধ্যতামূলক নয়। এদের বাজেট সাধারণ সচিবালয় ও তার অঙ্গসংগঠন এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে স্বতন্ত্র থাকবে এবং তা তাদের নিজস্ব বিধিমালার শর্ত মোতাবেক স্ব স্ব আইন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হবে।

---

[১১২]. এ বি এম হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯।

[১১৩]. *The Europa World Year Book 2013*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭।

Dhaka University Institutional Repository

- আন্তর্জাতিক ইসলামি বার্তা সংস্থা (IINA):

  ১৯৭০ সালে আন্তর্জাতিক ইসলামি বার্তা সংস্থা (International Islamic News Agency) আত্মপ্রকাশ করলেও ১৯৭২ সালে এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। এর সদর দফতর সৌদি আরবের বন্দরনগরী জেদ্দায়। সংস্থাটির প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে– বার্তা আদান-প্রদানে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সদস্য দেশভুক্ত বার্তা সংস্থাগুলোর মাঝে কারিগরি সহযোগিতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলি আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করার লক্ষ্যে কাজ করা।[১১৪]

- ইসলামি দেশসমূহের প্রচার সংস্থা (ISBO):

  ১৯৭৫ সালে ৬ষ্ঠ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে জেদ্দাভিত্তিক ইসলামি দেশসমূহের প্রচার সংস্থা (Islamic States Broadcasting Organization) আত্মপ্রকাশ করে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে–রেডিও ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, মুসলিম স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি তুলে ধরা এবং বিশ্বে ইসলামি ঐতিহ্য বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা।

- ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (IDB):

  ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অর্থমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর সদর দফতর জেদ্দায়।

- ইসলামি শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ISESCO):

  ১৯৭৯ সালে ফেজ-এ অনুষ্ঠিত ১০ম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে ইসলামি শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (Islamic Educational, Science and Cultural Organization) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৮১ সালের ৩য় শীর্ষ সম্মেলনে এটি অনুমোদন লাভ করে। এর সদর দফতর মরক্কোর রাবাতে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে–ওআইসির শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান, সদস্য দেশসমূহের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রচেষ্টাসমূহকে শক্তিশালী করা এবং উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা।

---

১১৪. Inamullah Khan (Editor-in-chief), *World Muslim Gezetter,* (Delhi: International Islamic Publishers, 1992), P. 754.

Dhaka University Institutional Repository

❖ সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Affiliated Institutions)[১১৫]

কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান যাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ওআইসি সনদে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাদেরকে ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সভার অনুমোদনক্রমে ওআইসির সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেয়া হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ গ্রহণের বিষয়টি সদস্য দেশগুলোর প্রতিষ্ঠান ও অঙ্গসংগঠনগুলোর জন্য ঐচ্ছিক ও মুক্ত থাকবে। এদের বাজেট সাধারণ সচিবালয় ও তার অঙ্গসংগঠন এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে স্বতন্ত্র থাকবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা যেতে পারে। তারা অধীনস্থ এবং বিশেষায়িত সংগঠনগুলো থেকে স্বেচ্ছাসেবামূলক সাহায্য পেতে পারে।

- ইসলামি বাণিজ্য ও শিল্প চেম্বার (ICCI):

  করাচিতে সদর দফতর বিশিষ্ট ইসলামি বাণিজ্য ও শিল্প চেম্বার (Islamic Chamber of Commerce and Industry) ১৯৭৭ সালে আত্মপ্রকাশ করে। আন্তঃওআইসি ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এটি কাজ করে থাকে।

- ইসলামি সংহতি স্পোর্টস ফেডারেশন (ISSF):

  ১৯৮০ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ১১তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে এর প্রতিষ্ঠা, ১৯৮১ সালে ৩য় শীর্ষ সম্মেলনে অনুমোদন এবং ১৯৮৫ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয়। এর সদা দফতর সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে–মুসলিম যুবসমাজে খেলাধুলার প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিচিতি বজায় রাখা এবং সদস্য দেশগুলোর যুবসমাজে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে সংহতি বাড়িয়ে তোলা। সদস্য দেশগুলোর খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিশেষ করে আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অলিম্পিক বা সমমানের অন্যান্য প্রতিযোগিতায় মুসলিম যুবসমাজের ভূমিকার সমন্বয় সাধনের বিষয়টি Islamic Solidarity Sports Federation-এর অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়। এছাড়াও এটি খেলাধুলা সংশ্লিষ্ট পর্যটন সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য রক্ষা, বিনোদন এবং শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।[১১৬]

- ইসলামি জাহাজ শিল্প মালিক সংস্থা (OISA)

  ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত ৩য় শীর্ষ সম্মেলনে ইসলামি জাহাজ শিল্প মালিক সংস্থা (Organization of the Islamic Ship owners Association) এ জন্ম। এর

---

১১৫. *The Europa World Year Book 2013*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭।

১১৬. Inamullah Khan, ibid, P. 769.

Dhaka University Institutional Repository

সদর দফতর বন্দরনগরী জেদ্দায় অবস্থিত। মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি সমন্বিত নৌপরিবহন নীতিমালা তৈরির লক্ষ্যে এটি কাজ করে থাকে।

- ইসলামি রাজধানী ও নগর সংস্থা (OICC)

  ১৯৭৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৯ম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে ইসলামি রাজধানী ও নগর সংস্থা (Organization of Islamic Capitals and Cities) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ১৯৭৯ সালে ফেজ-এ অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ১০ম সম্মেলনে এর বিধিমালা অনুমোদন করা হয়। এর সদর দফতর মক্কা নগরীতে হলেও সাধারণ সচিবালয় কার্যক্রম পরিচালনা করে জেদ্দা থেকে। ইসলামি নগরসমূহের সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত, নাগরিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন এই সংস্থার মূল লক্ষ্য। এছাড়াও এটি ইসলামি রাজধানী ও নগরসমূহের পরিচিতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং ইসলামি রাজধানী ও নগরগুলোর জন্য সামগ্রিক এবং আধুনিক নগর ব্যবস্থা, পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ণে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- আন্তর্জাতিক ক্রিসেন্ট সংক্রান্ত ইসলামি কমিটি (ICCI):

  ৮ম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭৭ সালে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলিতে আন্তর্জাতিক ক্রিসেন্ট সংক্রান্ত ইসলামি কমিটি (Islamic Committee of the International Crescent) গঠিত হয়। এর সদর দফতর লিবিয়ার বেনগাজী শহরে। এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে-যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্ট দুর্ভোগ লাঘব করা।

- সংলাপ ও সহযোগিতা সংক্রান্ত ইসলামি সংস্থার যুবফোরাম (ICYF-DC):

  ২০০৪ সালের জুনে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ৩১তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই ফোরামের সৃষ্টি হয় এবং একই বছর ডিসেম্বরে আজারবাইজানের বাকু শহরে প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংলাপ ও সহযোগিতা সংক্রান্ত ইসলামি সংস্থার যুবফোরাম (Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Co-operation) যাত্রা শুরু করে। এটি ওআইসি সদস্য দেশগুলোর যুবসমাজের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের জন্য কতগুলো লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। এগুলো হচ্ছে-যুব স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি তুলে ধরা, টেকসই উন্নয়নে সমর্থন প্রদান, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার, নতুন প্রজন্মের নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মাঝে সংলাপ অনুষ্ঠান।

Dhaka University Institutional Repository

- আরব-ইসলামিক আন্তর্জাতিক স্কুল ফেডারেশন (WFAIIS)

  ১৯৭৬ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ৭ম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে আরব-ইসলামিক আন্তর্জাতিক স্কুল ফেডারেশন (World Federation of Arab-Islamic International Schools) এর প্রতিষ্ঠা। এর মূল কেন্দ্র কায়রোতে হলেও আরো ৩টি আঞ্চলিক কেন্দ্র–মদিনা (সৌদি আরব), পেশোয়ার (পাকিস্তান) ও কুয়ালালামপুরে (মালয়েশিয়া) অবস্থিত। ফেডারেশনটি বিশ্বব্যাপী আরবি ভাষা ও ইসলামি সংস্কৃতি সম্প্রসারণে কাজ করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুনর্গঠনের ইতিহাস

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৮২ সালে নিয়ামেতে ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ১৩তম সম্মেলনে সর্বপ্রথম 'ওআইসি পুনর্গঠন' নামে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি পরবর্তীকালে 'নিয়ামে প্রক্রিয়া' নামে পরিচিতি লাভ করে এবং এতে মহাসচিবের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের আহবান জানানো হয়। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি ওআইসির সাধারণ সচিবালয় ও তার অঙ্গসংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রগুলোর কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে একটি নির্দেশমালাসহ তাদের কার্যাবলী ও কার্যসম্পাদনের পর্যালোচনা ও যাচাই করার পরে তাদের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধনের বিভিন্ন দিক ও উপায় বিবেচনা করবে। ১৯৮৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত চতুর্দশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে কমিটির কার্যাবলী পর্যালোচনা করা হয়। সদস্য দেশগুলো এবং কেন্দ্রসমূহের প্রধানদের অনুরোধ করা হয় যেন তারা বিশেষজ্ঞ কমিটিকে বিষয়টি নিয়ে তাদের পরবর্তী পর্যালোচনা শুরু করার পক্ষে মতামত দেন। ১৯৮৪ সালে ঘানাতে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে ওআইসির সাধারণ সচিবালয় ও এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পুনর্গঠনের সাথে সম্পর্কিত প্রস্তাবটিতে পুনর্গঠনের প্রয়োজন এমন সব ক্ষেত্র সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদাবলি অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১১৭]

পুনর্গঠন সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি ১৯৮১ সালে মক্কা ও তায়েফে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত সদস্য দেশগুলোর মাঝে অর্থনৈতিক সহযোগিতা শক্তিশালী করার জন্য কার্যকরী পরিকল্পনার সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার কর্মসূচিকে এক অপরিহার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সম্মেলনে সাধারণ সচিবালয় ও তার অধীনস্থ সব সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রগুলোর যথাযথ কার্যাবলি বরাদ্দ সম্বলিত এক নির্দেশনার জন্য তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার স্থায়ী কমিটিকে (COMCEC) আমন্ত্রণ জানানো হয়।

---

[১১৭].<http://www.oic-oci.org/english/conf/fm/15/15%20icfm-admin en.htm/Resolution%20No.% 2014/15-AF>

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ওআইসির সাধারণ সচিবালয়ের অনুরোধে উল্লিখিত ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবনার পাশাপাশি ওআইসির কাঠামোর ভিতরে থেকে ১৯৮৬ সালে সৌদি জনপ্রশাসন সংস্থা সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে একটি পর্যালোচনা পরিচালনা করে। সৌদি জনপ্রশাসন সংস্থার নিরীক্ষাতে দেখা যায় যে ওআইসির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় বেশ দুর্বল। আর এই দুর্বল হওয়ার কারণগুলো হল:[১১৮]

- সঠিক পরিকল্পনার অনুপস্থিতি ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুখ্য বিষয়বস্তু উপেক্ষা করে গৌণ বিষয়ে মনোযোগ প্রদান এর জন্য দায়ী। এছাড়াও অর্থনৈতিক সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ওআইসির পক্ষে পূর্বের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কঠিন করে তুলেছে।
- নিয়মিত মূল্যায়নের ঘাটতি সমস্যাগুলো আরও ঘনীভূত করেছে। যদি পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরবিন্যাস ও সাধারণ কর্মসংস্থার বিপরীতে ওআইসির সঙ্গতিপূর্ণ কর্মকান্ড কর্মসূচির নিয়মিত মূল্যায়ন করা যেত তাহলে খুব সহজে সমন্বয়তা অর্জন করা যেত।
- ওআইসির বিভিন্ন বিধিমালায় লক্ষ্যবস্তু কার্যকরী দিকের পুনরাবৃত্তির কারণে ওআইসির সংস্থাগুলোর অর্জিত লক্ষ্য অর্জনের সামর্থ্য ব্যাহত হয়েছে। এক ধরনের লক্ষ্যবস্তু ওআইসির প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি না করে প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি এবং অর্থনৈতিক সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। এই সমস্যাটি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে যখন ওআইসির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের দায়িত্বাবলীতে পুনরাবৃত্তি সংগঠনগুলোর আইনি দলিল দ্বারা অনুমোদিত হয়ে থাকে।

এছাড়াও গবেষণার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলোর মাঝে রয়েছে তথ্যের অব্যাহত প্রবাহের অপ্রাপ্যতা এবং জনশক্তি স্বল্পতা। এছাড়াও ওআইসির অঙ্গসংগঠনগুলোর অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য, যেগুলোর মাঝে অনেকেই সদস্য দেশগুলো থেকে সরাসরি তহবিল পেয়ে থাকে, পারস্পরিক সমন্বয়হীনতার জন্য দায়ী।

দুর্বল সমন্বয়তার কারণগুলো বের করার পর সৌদি জনপ্রশাসন সংস্থা ওআইসির সংগঠনগুলোর কার্যসম্পাদন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ পেশ করে। এর মাঝে রয়েছে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন প্রতিষ্ঠার মৌলিক মানদন্ড, পুনরাবৃত্তির বিলুপ্তি এবং যৌক্তিক ব্যয় কাঠামো পুনর্গঠন, ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ওপর সুপারিশমালা। এদিকে ইসলামি শিক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক (ISESCO) প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে নিজেদের মর্যাদার উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা উন্নতি সাধনের জন্য একটি প্রস্তাবনা পেশ করে, যার মাঝে রয়েছে সেটার নিজস্ব কর্তৃত্বের প্রসারণ।

---

[১১৮] একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রায়োগিক দিক থেকে ISESCO প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় "ইসলামি মতবিনিময়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর তত্ত্বাবধানে" এবং মূল সনদের ৫(ক) অনুচ্ছেদের শর্তাবলী অনুসারে:[১১৯]

> একদিকে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামি মতবিনিময় প্রতিষ্ঠানের মত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান সম্পূরক ও পরিপূরক হিসেবে কর্মসম্পাদন করবে এবং অন্যদিকে থাকবে সদস্য দেশসমূহের ইসলামি সংহতি বৃদ্ধির লক্ষ্য। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামি মতবিনিময়কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের কাঠামোর ভেতরে থেকে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন ইসলামি বিজ্ঞান ও কারিগরি উন্নয়ন সংস্থা, ইসলামি শিক্ষার বৈশ্বিক কেন্দ্র, ইসলামি ইতিহাস, কলা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রর পাশাপাশি ইসলামি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন, তাদের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে যোগ্যতানুসারে কাজ করবে। বিশেষাধিকারের দিক থেকে ইসলামি প্রতিষ্ঠান ISESCO এবং উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে কখনও পুনরাবৃত্তি বা সাংঘর্ষিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হবে না। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত অঙ্গসংগঠন ও বিভাগসমূহের সাথে দ্বিধাবিভক্তির সৃষ্টি হবে না। এই সকল সংগঠনের আওতার বাইরে থেকে ISESCO তার সকল কাজ সম্পন্ন করবে।

কাঠামো পুনর্গঠন:

১৯৮৯ সালে রিয়াদে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে প্রাতিষ্ঠানিক সংকল্প এবং পরবর্তী দশকগুলোতে ওআইসি এবং এর অঙ্গসংগঠন ও সহযোগী সংস্থাগুলোর কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ বিধিমালা নির্ধারণ করা হয়। এই সম্মেলনে "ইসলামি সম্মেলন সংস্থা ও এর অধীনস্থ অঙ্গসংগঠন, বিশেষায়িত ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায়োগিক দিক" শিরোনামে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হয় যেখানে পুনর্গঠন ও দৃঢ়করণের পক্ষে প্রস্তাবনা রাখা হয়। এত আরোও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যাতে করে সাধারণ সচিবালয় ও ওআইসির অঙ্গসংগঠন এবং বিশেষায়িত ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মকান্ডগুলোকে যৌক্তিক করে তোলার কার্যকরী উপায় খুঁজে পায়। ওআইসির অধীনস্থ অঙ্গসংগঠনগুলো, বিশেষায়িত ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্নোক্ত শ্রেণিবিন্যাসটি গ্রহণ করে।

ক. **অধীনস্থ অঙ্গসংগঠনসমূহ:** ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন বা ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ওআইসির কাঠামোর আলোকে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। সদস্য দেশগুলো সরাসরি এই অঙ্গসংগঠনগুলোর সদস্য হয়ে যাবে এবং তাদের বাজেট পরবর্তী সভার দ্বারা অনুমোদিত হবে।

---

[১১৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

খ. **বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ:** ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন বা ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ওআইসির কাঠামোর আলোকে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্যতা সদস্য দেশগুলোর জন্য ঐচ্ছিক ও মুক্ত থাকবে। এদের বাজেট সাধারণ সচিবালয় ও তার অঙ্গসংগঠন এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে স্বতন্ত্র থাকবে এবং তা তাদের নিজস্ব বিধিমালার শর্ত মোতাবেক স্ব স্ব আইন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হবে।

গ. **সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ:** এ প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্য পদ ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর প্রতিষ্ঠান ও অঙ্গসংগঠনের জন্য ঐচ্ছিক ও মুক্ত থাকবে। এদের বাজেট সাধারণ সচিবালয় ও তার অঙ্গসংগঠন এবং বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে স্বতন্ত্র থাকবে। ইসলামি শীর্ষ বৈঠকে বা পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ইসলামি সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা স্থাপিত হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা যেতে পারে। তারা অধীনস্থ এবং বিশেষায়িত সংগঠনগুলো থেকে স্বেচ্ছাসেবকমূলক সাহায্য পেতে পারে।

- অঙ্গসংগঠনগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন

ওআইসির পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় রিয়াদে অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে অঙ্গসংগঠনগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-[১২০]

১. সম্মেলনে সাধারণ সচিবালয় ও ওআইসির অঙ্গসংগঠনগুলোর (অধীনস্থ অঙ্গসংগঠন, বিশেষায়িত ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান) মধ্যকার কর্মকান্ডের মাঝে সমন্বয়ের ও পর্যবেক্ষণের জন্য মহাসচিব মহোদয়কে একটি কাঠামো স্থাপনের জন্য বলা হয়। আরও উল্লেখ করা হয় যে, এই কাঠামো স্থাপনের জন্য কোনো নতুন অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতি দেয়া হবে না।

২. সাধারণ সচিবালয় ও ওআইসির অঙ্গসংগঠনগুলোর কর্মকান্ডের মাঝে সমন্বয় সাধন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য একটি বাৎসরিক সভা আহবান করতে মহাসচিব মহোদয়কে অনুরোধ জানানো হয়। মহাসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানেরা ও পরিচালকবৃন্দ অংশগ্রহণ করবে।

- বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিবেদন

১৯৯৪ সালে কাসাব্লাঙ্কায় অনুষ্ঠিত সপ্তম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে ওআইসির সাফল্য এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এর সামর্থ্য পর্যালোচনা করার পর এর সম্পৃক্ততা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি নতুন পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়:

---

[১২০].<http://www.oic-oci.org/english/conf/fm/18/18%20icfm-admin-en.htm#RESOLUTION NO. 6/18-AF>

Dhaka University Institutional Repository

বিগত পঁচিশ বছরে প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য যাচাই করার জন্য সদস্য দেশগুলো থেকে বিভিন্ন পেশার খ্যাতিমান ব্যক্তিদেরকে নিয়ে একটি গোষ্ঠী অবিলম্বে গঠন করা হোক, যারা প্রতিষ্ঠানটির দুর্বলতা ও শক্তিমত্তা চিহ্নিত করবে, এর লক্ষ্যগুলো পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে পর্যালোচনা করবে এবং ইসলামি সংহতি ও সমন্বয়তার প্রবর্তক হিসেবে এর দক্ষতা ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ ও উম্মাহর উন্নয়নের জন্য সদস্য দেশগুলোর মাঝে সমন্বয়তার উন্নয়নকে আরও শক্তিশালী ও বিস্তৃত করার জন্য একটি সার্বিক ও সঠিক পরিকল্পনার বিষয়ে একটি সুপারিশমালা ২৩তম পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ইসলামি সম্মেলনে পেশ করবে।[১২১]

আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ওআইসি মহাসচিব শীর্ষ বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন। তিনি সদস্য দেশগুলোর সাথে আলোচনাপূর্বক, ভৌগোলিক বণ্টন পদ্ধতিকে বিবেচনায় রেখে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান করবেন। ওআইসির সাধারণ সচিবালয় ও সকল অঙ্গসংগঠনগুলোকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পূর্ণ সহায়তা প্রদানের আহবান জানানো হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৯৫ সালের জুনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রারম্ভিক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তিনটি উপকমিটি গঠন করা হয়:

১. রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত কমিটি;
২. অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কমিটি এবং
৩. সাংস্কৃতিক ও তথ্য বিষয়ক কমিটি।

রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত কমিটি মতামত পেশ করে যে ইসলামি সংহতির ধারণাকে আরও আধুনিকায়ন এবং আরও সক্রিয়ভাবে অনুপ্রাণিত করা জরুরি প্রয়োজন। শীতল যুদ্ধের (Cold War) আর্থ-সামাজিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিষয়ক পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে এবং ঔপনিবেশিকতা মোচনের ও উন্নয়নের সময়ের থেকে বর্তমান মুসলিম বিশ্ব যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে তার ভিন্ন প্রকৃতির কারণে, অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন সমষ্টিগত ইসলামি কর্মোদ্যোগ অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় যে,

---

[১২১]. (It decided to establish immediately an Eminent Persons Group comprising a select number of outstanding individuals from various disciplines drawn from member states to take stock of the achievement of the Organization over the past 25 years; to identify its strength and weakness; to review its objectives in the light of changing circumstances; and submit to the Twenty-third Isalmic Conferences of Foreign Ministers recommendations on appropriate measures that should be taken to enhance the Organizations effectiveness and relevance as the promoter of Islamic solidarity and cooperation and an overall perspective plan to expand and strengthen development cooperation among member countries for the progress of the Ummah). বিস্তারিত: <http://www.oic-oci.org/english/conf/is/7/7th-is-summit.htm#FINAL COMMUNIQUE>.

Dhaka University Institutional Repository

সদস্য দেশগুলোর মাঝে সমষ্টিগত ইসলামি নিরাপত্তার ধারণাকে উন্নত ও মিলিত করতে হবে, প্রতিরোধমূলক কূটনীতি ও সাংঘর্ষিক প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে ওআইসিকে আরও কার্যকরী ভূমিকা রাখার ক্ষমতা প্রদান করা উচিত এবং শান্তি ও নিরাপত্তা সাধনের জন্য ওআইসিকে অতিরিক্ত কার্যসাধন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কমিটি ওআইসিকে পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সম্পদ বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে। এটি অধীনস্থ অঙ্গসংগঠনগুলোর অর্থনৈতিক সম্পদ, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং প্রায়োগিক মানের প্রবর্তন পর্যবেক্ষণের পক্ষে দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করে।

প্রাথমিক সভার তিনমাস পর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠীটি ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বরে একত্রিত হয় এবং তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে ওআইসি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছে।[১২২] প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় যে ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান এবং মুসলিম সংখ্যালঘু বিষয়ে কার্যকরী ও ইতিবাচক ভূমিকা ওআইসি পালন করেছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ওআইসির সাফল্যের কথাও এটি উল্লেখ করে, যেমন- পরিকল্পনা ও চুক্তির সমাপ্তিকরণ বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান ও অঙ্গসংগঠনসমূহ স্থাপন এবং তথ্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য। এটি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিষয়ক কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করতে প্রস্তাব দেয় যেখানে বলা হয়েছে যে ওআইসির সাধারণ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর অবশ্যই বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও উন্নয়ন বিষয়ক ইসলামি ফাউন্ডেশনের (Islamic Foundation for Science, Technology and Development-IFSTAD) কর্মকান্ড ও কর্মসূচি অধিগ্রহণ করা উচিত, কারণ এই প্রতিষ্ঠানটি তার সমস্যাগুলো মোকাবেলায় সমর্থ হয়নি। একইরূপে প্রতিবেদনটি কাসাব্লাঙ্কাতে অবস্থিত ইসলামি বাণিজ্য উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মকান্ডগুলোকে সাধারণ সচিবালয়, আইডিবি এবং ইসলামি বাণিজ্য ও শিল্প পর্ষদের মাঝে ভাগাভাগি করে নিতে বলেছে।[১২৩]

এটি পরামর্শ দেয় যে ইসলামি উম্মাহ যে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে তার আলোকে ইসলামি সংহতির সমন্বিত ধারণা, বিশেষ করে আঞ্চলিক পর্যায়ে সংজ্ঞায়িত ও বিস্তৃতিকরণ প্রয়োজন। শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে ওআইসির ভূমিকা উন্নয়নে অতিরিক্ত কার্যসাধন নীতি স্থাপনের পক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সুপারিশ করে। এটি ওআইসির সাধারণ সচিবালয়ের ক্ষমতা ও ভূমিকা আরও বৃদ্ধি করার সুপারিশ করে যাতে করে এটি সঙ্কটকালে মতদ্বন্দ্বের মধ্যস্থতা ও সমাধান করতে

---

[১২২]. বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিবেদন (Report of the Eminent Persons Group), জেদ্দা: ওআইসির অভ্যন্তরীণ অপ্রকাশিত দলিল, ১৯৯৫, পৃ. ৫।

[১২৩]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

পারে। এছাড়াও ওআইসির আঞ্চলিক অফিস স্থাপন এবং সদস্য দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও যোগাযোগ বৃদ্ধি করার জন্য সাধারণ সচিবালয়ে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী যোগাযোগ কার্যসাধন নীতি স্থাপনের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।[১২৪] প্রতিবেদনটি সদস্য দেশগুলোর নিজস্ব খাতগুলোতে উন্নয়ন সাধনের পক্ষে সুপারিশ করেছে। এটি সাংস্কৃতিক এবং তথ্য ক্ষেত্রকে নিজস্ব ক্ষমতায়নের পক্ষে সুপারিশ করেছে যাতে করে তা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নতুন উন্নয়নমূলক বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং ইসলামি বিশ্বের বিভিন্ন অংশের মাঝে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা সৃষ্টি করতে ইসলামি সংহতির ধারণাকে তুলে ধরতে পারে।

আন্ত:সরকারি বিশেষজ্ঞ দল:

১৯৯৭ সালে তেহরানে অনুষ্ঠিত ৮ম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া আরও একধাপ অগ্রসর হয়। সাধারণ সচিবালয়ের প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত ওআইসির মহাসচিব কর্তৃক প্রতিবেদনটি পর্যবেক্ষণের পর শীর্ষ সম্মেলনে ইসলামি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ওআইসির ভূমিকাকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেয়া হয় যাতে করে প্রতিষ্ঠানটি লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। সুতরাং শীর্ষ সম্মেলনে একটি স্বাধীন আন্ত:সরকারি বিশেষজ্ঞ দল গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং সাধারণ সচিবালয়ের প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব একে দেয়া হয় এবং এর মধ্যে বিদ্যমান যে কোনো প্রস্তাবের বিষয়ে সুপারিশমালা প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয় এবং সেই সুপারিশমালা ২৫তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে পেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।[১২৫]

আন্ত:সরকারি বিশেষজ্ঞ দলটি ১৯৯৮-২০০২ সাল পর্যন্ত ৪টি সভার আয়োজন করে।[১২৬] ১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে দলটি জেদ্দায় তাদের প্রথম সভার আয়োজন করে যেখানে দলটি ওআইসির বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে:

- ওআইসির বিদ্যমান কাঠামোগত সীমার মধ্যে থেকে এবং এর সনদের নীতিসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও অঙ্গসংগঠনের অন্যান্য নিয়মকানুন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির পুনর্গঠন করতে হবে;
- নতুন কোন অঙ্গসংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হবে না;
- প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুদ্ধারের বিষয়ে নমনীয়তা দেখাতে হবে;

---

[১২৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

[১২৫].<http://www.oic-oci.org/english/conf/is/8/8th-is-summit.htm#FINAL COMMUNIQUE>.

[১২৬]. সভাগুলো ১৯৯৮ এর ফেব্রুয়ারি, ২০০০ এর ফেব্রুয়ারি, ২০০১ এর এপ্রিল ও ২০০২ এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- এটা নিশ্চিত করতে হবে যে পুনর্গঠন ও পুন:কাঠামো স্থাপনের প্রক্রিয়া সমন্বিত ও পূর্ণ একটি প্রক্রিয়া।

দলটি আরও গুরুত্ব প্রদান করে যে, এ সকল প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন মহাসচিব মহোদয় তার আওতায় পরিচালনা করার ক্ষমতা লাভ করবেন এবং এছাড়াও সনদ কর্তৃক তার ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও বিদ্যমান সিদ্ধান্তমালা অনুসারে তিনি এ কার্য সম্পাদন করবেন। নিয়োগ প্রদানের প্রশ্নে দলটি উচ্চ যোগ্যতা, বিশেষায়িত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ওপর জোর দান করেছেন।[১২৭]

অ্যাকসেনচারের উদ্যোগ[১২৮]:

২০০০ সালের ডিসেম্বরে দোহায় অনুষ্ঠিত ৯ম ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে সাধারণ সচিবালয়ের ওপর এ মর্মে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, মালয়েশিয়া সরকার, ২৭তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সভাপতি এবং ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে পরামর্শক্রমে ওআইসিতে বিদ্যমান কাঠামোকে পুনর্গঠিত করে আরও দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে একটি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণা বিষয়ক ভার ন্যস্ত করা যাবে এমন প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত করতে হবে।[১২৯] মালয়েশিয়ার অ্যাকসেনচার এ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান। মন্ত্রণা বিষয়ক এ প্রতিষ্ঠানটিকে গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয় এবং আইডিবি এই গবেষণার সমস্ত খরচ বহনের জন্য রাজি হয়। আন্ত:সরকারি বিশেষজ্ঞ দলটি ২০০২ সালের ডিসেম্বরে জেদ্দায় একটি সভা আহবান করে যার উদ্দেশ্য ছিল এই গবেষণার নীতিমালা নির্দেশ করা। নির্দেশিত নীতিমালাগুলো নিম্নরূপ:[১৩০]

- কার্যাবলির পদ্ধতিসমূহ হালনাগাদ ও আধুনিকায়নে এবং একই সাথে নমনীয়তা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি ও কার্যসম্পাদনের মাত্রা বাড়ানো।
- সাধারণ সচিবালয়ের জন্য নির্দেশিত বাজেটে অতিরিক্ত খরচের জন্য সদস্য দেশগুলোর ওপর বোঝা সৃষ্টি হবে এমন সিদ্ধান্তগুলো পরিহার করতে হবে।
- নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন না করে বিদ্যমান কেন্দ্রগুলো ও অঙ্গসংগঠন সমূহের পূর্ণ ব্যবহার করতে হবে।
- ওআইসির সনদ সংশোধনের প্রয়োজন হয় এমন ধারণাবলিকে পরিহার করতে হবে।

---

[১২৭]. একমেলেদ্দি ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

[১২৮]. অ্যাকসেনচার (Accenture) হল মালয়েশিয়ার আধুনিকায়ন ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা সংক্রান্ত ইউনিটের তত্ত্বাবধানে নির্বাচিত একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক সংগঠন। এই সংগঠনকে ওআইসি সাধারণ সচিবালয়ের পুনর্গঠন সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

[১২৯]. <http:// www.oic-oci.org/english/conf/is/9/9th-is-sum-administrative.htm>.

[১৩০]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

- ওআইসি শীর্ষ বৈঠক ব্যুরোকে কার্যকর করতে হবে এবং বার্ষিক পর্যালোচনা বিষয়ক সভা প্রয়োজন অনুসারে আহবান করতে হবে।
- মন্ত্রী পর্যায়ের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের আহবানকে বিবেচনায় নিতে হবে।
- সাধারণ ও জরুরী বিষয়গুলোকে বিবেচনার জন্য ওআইসির স্থায়ী প্রতিনিধিদের নিয়ে নিয়মিত সভা করার বিষয়টি গণ্য করতে হবে।
- ওআইসির অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে দূর করার ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে।

এই নীতিমালা অনুযায়ী অ্যাকসেনচার ২০০৩ সালের জুলাইতে তার পর্যালোচনামূলক অনুশীলন শুরু করে এবং ২০০৫ সালের আগস্টে সমাপ্ত করে, যেখানে ওআইসির কাঠামো, কর্মকান্ড ও কর্মসূচি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াবলি নিয়ে সুপারিশমালাসহ একটি সাধারণ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। সাধারণ সচিবালয় প্রতিবেদনটি নিরীক্ষণ করে এবং নতুন ভবিষ্যতমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে উন্নয়নের একটি মূল্যবান কাঠামোগত স্তম্ভ হিসেবে সেটিকে চিহ্নিত করে। তা সত্ত্বেও বেশ কিছু মতামত লিপিবদ্ধ করা হয় সাধারণ সচিবালয়ের পাশাপাশি সদস্য দেশগুলো দ্বারা। সেই মন্তব্যগুলোর কিছু অংশ:[১৩১]

- যদিও সাধারণ সচিবালয়ের দৈহিক কাঠামো ও অভ্যন্তরীণ কর্মসংখ্যা অ্যাকসেনচার কর্তৃক ভালোভাবে গবেষিত হয়েছে, তবে প্রতিবেদনটির কিছু অংশকে অনেকটা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চর্চা বলে মনে হয়েছে।
- একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য কোনো নতুন বা নির্দিষ্ট কাঠামো প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পারেনি। প্রদত্ত নীতিমালার কারণে প্রতিবেদনটি সম্ভবত কিছুটা বাধার সম্মুখীন হয়েছে, যার উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে অবকাঠামো পুনর্গঠনগত প্রক্রিয়া যেন সনদ সংশোধনের দিকে না যায় অথবা সদস্য দেশগুলোকে যেন নতুন কোনো অর্থনৈতিক অঙ্গীকারে আবদ্ধ না হতে হয় এ ধরনের নীতির কথা।
- গবেষণাটি আরও বিস্তারিত পরিসর দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারত যেখানে নতুন চ্যালেঞ্জগুলোর বিষয়ে একটি নিগূঢ় পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারত এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে একটি সমধর্মী তুলনামূলক নিরীক্ষণ ও বিদ্যমান কাঠামোর জন্য নতুন দিক হিসেবে যেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারত।
- সাধারণ সচিবালয় ও ওআইসির বিভিন্ন বিদ্যমান কমিটিগুলোর ভূমিকা বিষয়ক একটি কার্যসাধন পদ্ধতিগত সুপারিশ প্রতিবেদনে থাকা উচিত ছিল।

---

১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

- কিছু সদস্য দেশের মতানুসারে গবেষণাটি ওআইসির নাম পরিবর্তন বিষয়ক ইস্যুটি ছুঁয়ে যেতে পারত যাতে করে ওআইসির আন্তর্জাতিক বহুমাত্রিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠতে পারে এবং সনদ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে পারত যাতে করে ওআইসির একবিংশ শতাব্দীর দূরদৃষ্টি প্রতিফলিত হতে পারে।

অ্যাকসেনচার প্রণীত এই গবেষণাটির অনেক ইতিবাচক দিক থাকলেও বিভিন্ন কারণে এর সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা কঠিন ছিল, যার মাঝে উল্লিখিত কারণ হল সাধারণ সচিবালয় ও সদস্য দেশগুলো দ্বারা বর্ণিত মন্তব্য ও আপত্তিসমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ওআইসির সংস্কার কার্যক্রম

ওআইসির পুরো ইতিহাস জুড়েই সংস্কারের গুরুত্ব অনুভূত হলেও এ প্রক্রিয়া গতি লাভ করে ২০০৩ সালের অক্টোবরে মালয়েশিয়ার পুত্রজায়াতে অনুষ্ঠিত ১০ম ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে। এ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে মুসলিম বিশ্বের দু:খজনক পরিস্থিতি দূরীকরণের লক্ষ্যে ওআইসির পুনর্গঠন এবং একে আরো শক্তিশালীকরণের দাবী জোরোলোভাবে তুলে ধরা হয়।[১৩২]

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম মহাসচিব

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ওআইসি মহাসচিব নির্বাচন করা হত ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে ঐকমত্যের ভিত্তিতে। তবে ২০০৪ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ৩১তম সভায় ওআইসির সদস্য দেশগুলোর ভোটে প্রথমবারের মত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ওআইসির মহাসচিব নির্বাচিত হয়।[১৩৩] এ প্রক্রিয়ায় নতুন মহাসচিব নির্বাচন করাটা ওআইসির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব নতুন দর্শনের সূচনা করে যা সংস্কার, পুনর্গঠন, দক্ষতা ও ফলাফলকেন্দ্রিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন দেয়। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম মহাসচিব হলেন একমেলেদ্দিন ইহ্সানোগলু। তিনি ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পূর্বে তিনি ওআইসির অন্যতম প্রধান অঙ্গসংগঠন ইসলামি ইতিহাস, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্রের (IRCICA) প্রধান কার্যনির্বাহক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্ব গ্রহণকালে তিনি উদ্বোধনী ভাষণে ওআইসির উন্নয়নে যে ক্ষেত্রগুলোতে আরও মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন সেগুলোর পাশাপাশি ওআইসির দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করেন এবং প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

---

[১৩২].We agree on the need to restructure and strengthen the Organization on the basis of its role, structure, methodology and decision-making processes. বিস্তারিত: <http://www.oic_oci.org/ english/conf/is/10/putrajaya_declaration.htm>

[১৩৩].The Conference unanimously elected H.E. Prof. Dr. Ekmeleddin Ihsanoglu, as incoming Secretary General for a term of four years starting from 1st January 2005. বিস্তারিত: <http://www.oic_oci.org/english/conf/fm/31/31%20icfm-fc-en..htm>

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন যে ওআইসি তখন পর্যন্ত তার সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশে ব্যর্থ হয়েছে এবং সদস্য দেশগুলোর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নিজেকে পূর্ণ ও শক্তিশালীভাবে স্থাপন করতেও ব্যর্থ হয়েছে। ওআইসির বিপুল সদস্য সংখ্যা ও সদস্য দেশগুলোর মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে প্রতিটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছানো সহজ নয়। তবুও সদস্য দেশগুলো ও তাদের জনগণের মাঝে ইসলামি সংহতির প্রতি প্রবল আকর্ষণের বিষয়টি অনুধাবনের মাধ্যমে বেশ কিছু রাজনৈতিক বিষয় এবং কিছু সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছানো সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। এসব বিষয়ের মাঝে রয়েছে শিক্ষা, উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের পাশাপাশি ফিলিস্তিন, ইরাক, বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনা, কাশ্মীর, মুসলিম সংখ্যালঘু ও সম্প্রদায়ের মত সঙ্কট।[১৩৪]

এগুলোর ওপর ভিত্তি করে তিনি জোরালোভাবে মতপ্রকাশ করেন যে ওআইসি তার নিজস্ব সম্ভাবনা ও সামর্থ্যকে অনুধাবন করে এবং কাজে লাগিয়ে নিজস্ব অবদানকে সমৃদ্ধ করার, দক্ষতাকে বৃদ্ধি করার ও এর কার্যাবলীকে গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে তাঁর সুপারিশমালায় তিনি জোর দেন স্বচ্ছ, যৌক্তিক ও বাস্তবায়নযোগ্য সিদ্ধান্তমালা গ্রহণের ওপর যাতে করে মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরে ও বাইরে ওআইসির বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তবে এসব লক্ষ্য অর্জন ও মুসলিম উম্মাহর প্রধান স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সাফল্যের সাথে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সাথে সাথে প্রয়োজন সদস্য দেশগুলোর মাঝে দৃঢ় সহযোগিতা এবং ওআইসি ও তার প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনসমূহের দ্রুত সংস্কার ও পুনর্গঠন।

তিনি ১৯৭২ সালে গৃহীত ওআইসির সনদটির একটি সঠিক ও সমন্বিত পুনঃসংশোধনের দাবী করেন। কেননা ১৯৭২ সালে গৃহীত সনদটির মূল উদ্দেশ্য ছিল কেবল অপেক্ষাকৃত একটি ছোট প্রতিষ্ঠানের জন্য সভা আহবান ও পরিচালনার নির্দেশনা তৈরি করা। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই

---

[১৩৪]. I must honestly state that the OIC has not been able to fully achieve its potential and establish itself as a powerful entity capable of actively voicing the Muslim causes and making itself heard in the international arena. Given the large membership of the OIC and the diversities between its countries, it is certainly hard to reach cohesion of opinions on each and every matter but it must certainly be possible to achieve harmony and a collective spirit as it has been possible on many top political issues such as the problems of Al Quds and Palestine, Iraq, Bosnia and Herzegovina, the Turkish Cypriot State, the problem of Kashmir, the Muslim minorities and communities, among others, as well as over such problems of general common concern as educational, development and eradication of poverty. *Inaugural Statement of Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, Secretary General of the OIC (Jeddah, 28 December 2004) <http:// www.oic_oci.org>*

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিভঙ্গি কোনোভাবেই মুসলিম বিশ্বের বহুবিধ চাহিদা পূরণ করে সমসাময়িক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ট নয়।

সাধারণ সচিবালয়ের সংস্কার

সাধারণ সচিবালয়ের সংস্কারের বিষয়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংস্থার পুরো ইতিহাস জুড়ে সাধারণ সচিবালয়ের সংস্কারের বিষয়টি একটি স্থায়ী আলোচ্যসূচি হিসেবে বিবেচিত হয়। সাধারণ সচিবালয়ের কার্যাবলীকে বাধাগ্রস্ত করে এমন সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রধান দু'টো বিষয় হলো দক্ষ জনশক্তির অভাব ও অপ্রতুল আর্থিক সামর্থ্য। সুপারিশ ও স্বজনপ্রীতির ওপর ভিত্তি এবং দক্ষতাকে প্রাধান্য না দিয়ে লোক নিয়োগের রীতি সাধারণ সচিবালয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। সংস্কারের প্রেক্ষিতে নিয়োগ পদ্ধতির সংশোধন এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা–কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার প্রয়োজনীয়তা জরুরিভাবে অনুভূত হয়। সদস্য দেশগুলোর বাধ্যতামূলক চাঁদা প্রদান না করার কারণে সৃষ্ট বাজেটের অপ্রতুলতা, একটি তীব্র সমস্যা।[১৩৫] ওআইসির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত কমিশন যখন ২০০৫ সালে প্রথমবারের মত মিলিত হয় তখন তারা এ দুটো সমস্যাকে খুব সহজেই চিহ্নিত করে। এ কমিশন ওআইসির সনদের সংশোধনসহ এর সার্বিক সংস্কারে ওআইসির তৎকালীন মহাসচিব একমেলেদ্দিন ইহ্সানোগলু'র দেয়া পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

ওআইসি সঠিকভাবে কাজ করতে না পারার আরেকটি অন্যতম কারণ হল এর প্রস্তাবনাগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়া। দেখা যায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর খসড়াকরণ ও সুপারিশমালা অনেক সময়ই কিছুটা অযত্নসহকারে করা হয় এবং প্রায়ই এসব সিদ্ধান্ত সাধারণ সচিবালয়ে ফেলে রাখা হয়। এই সমস্যা দূর করতে প্রস্তাব দেয়া হয় যে, বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য ওআইসিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার পদ্ধতিকে ঐকমত্যের ভিত্তি থেকে বদলে ভোটের মাধ্যমে নেয়ার ব্যবস্থা করা।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কমিশন (Commission of Eminent Person-CEP)

২০০৩ সালে পুত্রজায়ায় অনুষ্ঠিত ১০ম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে নেয়া সিদ্ধান্ত এবং ২০০৪ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ৩১তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সমর্থন অনুসারে ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে মালয়েশিয়ার পুত্রজায়াতে ওআইসির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়।[১৩৬] এর লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন উপায় ও কৌশল উপস্থাপন করা যাতে করে মুসলিম

---

[১৩৫]. একমেলেদ্দি ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

[১৩৬]. *The Europa World year Book*, ibid, p. 416.

Dhaka University Institutional Repository

উম্মাহ একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে।[১৩৭] প্রথম সভায় কমিশনটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন সঙ্কটের পাশাপাশি এর প্রাতিষ্ঠানিক ত্রুটি, নিরাপত্তা বিষয়ক ইস্যু, দুর্নীতি, দুর্বল পরিচালনা এবং গণমাধ্যমের অসত্য ও ভুল সংবাদ পরিবেশনের ন্যায় সমস্যাবলী চিহ্নিত করে। পরবর্তীতে ২০০৫ সালের মে মাসে ইসলামাবাদে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে এসব সঙ্কট মোকাবেলায় বিভিন্ন সুপারিশমালা চিহ্নিত করে ৩টি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।[১৩৮]

১. একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বের চ্যালেঞ্জসমূহ (Challenge of the 21st Century)

প্রথম প্রতিবেদনে কমিশন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত অনেকগুলো সুপারিশ পেশ করে। যেমন–গণতন্ত্রায়ন, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদি। ওআইসির সদস্য দেশগুলোর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার ব্যাপারটি চিহ্নিত করা হয় এবং সাথে সাথে টেকসই উন্নয়নমুখী নীতিমালার প্রবর্তন ও উন্নয়ন করা, বিশ্বায়ন ও দারিদ্র্য মোকাবেলা করার উপায়ও চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও ওআইসির সদস্য দেশগুলোর মাঝে বাণিজ্য ও তথ্য-প্রযুক্তিগত আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতাও বৃদ্ধি করার সুপারিশ করা হয়। আরও উল্লেখ করা হয় একটি সমন্বিত নিরাপত্তা কাঠামো প্রণয়ন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার বিভিন্ন উপায় বের করা সম্পর্কে।

২. আলোকিত পরিমিতাচার[১৩৯] বিকাশে নীতিমালা ও কর্মসূচি (Policies and Programme for promoting Enlightened Moderations)

দ্বিতীয় প্রতিবেদনে পরিমিতাচারের বিষয়টির বিকাশ সাধনের জন্য দুটি প্রধান উপায় চিহ্নিত করা হয়। প্রথমত, শিক্ষার প্রসার যার মাধ্যমে মৌলবাদ, উগ্রবাদ, চরমপন্থা ও মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দলের মূলোৎপাটন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে কমিশন জোর দেয় ধর্মীয় জীবনে সংযমী আচরণের গুরুত্বের প্রতি এবং সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা, আইনের প্রয়োগ, আইনের সমানাধিকার, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা এবং আধিপত্যের ওপর। কমিশন আন্ত:ধর্মীয় এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে আন্ত:সভ্যতা সংলাপের

---

[১৩৭]. the preparation of a strategy and plan of action enabling the Islamic community to meet the challenge of the 21st century. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬।

[১৩৮]. <http:// www.oic_oci.org/ex-summit/english/em-persons-rep.htm>

[১৩৯]. আলোকিত পরিমিতাচার হচ্ছে উগ্রপন্থা পরিহার, যা নিজের কিংবা অন্য কারো ওপর কাঠিন্য প্রদর্শন করে। এ ধারণাটি এসেছে মূলত: (ক). পবিত্র কোরআনে মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী: সূরা বাকারা: ১৪৩–'উম্মাতান ওয়াসাতান' (মধ্যপন্থী সম্প্রদায়) এবং (খ). উগ্রবাদী পথ পরিহার করার লক্ষ্যে আল্লাহর বাণী: সূরা আন'আম:১৫৩– "নিশ্চিত এটি আমার পথ। অতএব এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চল না" থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। দ্বিতীয়ত, এটি পশ্চিমা শক্তিবর্গের যেসব পদক্ষেপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলমানদের প্রতি অবিচার, শোষণ, আগ্রাসন ও দীর্ঘমেয়াদি বিরোধের সৃষ্টি করছে সেগুলোকে চিহ্নিত করে।

এছাড়াও এই প্রতিবেদনে পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে জোর সুপারিশ করা হয় যাতে করে তারা পশ্চিমাদের বুদ্ধিমত্তা, নৈতিক ও বস্তুগত উন্নতির পেছনে ইসলামের ভূমিকা জানতে পারে। এটি আরও জোর দেয় কূটনীতি ও সংলাপের ওপরে আস্থা স্থাপনের বিষয়ে এবং আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার কাছে সাহায্য চাওয়ার ওপর। আন্তর্জাতিক বিরোধ মোকাবেলায় এই দুই পদ্ধতির ওপর আস্থা স্থাপন করে শক্তি প্রয়োগ ও একপাক্ষিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে বলে এই প্রতিবেদনে মত প্রকাশ করা হয়।[১৪০]

৩. ওআইসির সংস্কার ও পুনর্গঠন (OIC Reform and Restructuring)

ওআইসির সংস্কার ও পুনর্গঠন, সনদ সংশোধন এবং সাধারণ সচিবালয়কে শক্তিশালী করা, জনবল বৃদ্ধি করা, মহাসচিবের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, বিরোধ নিরসন ও শান্তি স্থাপনের বিষয়ে আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা, মিতচারিতার ধারণা প্রচার, নারীমুক্তি এবং সুশীল সমাজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত বিষয়াবলী কমিশনটি অনুমোদন করে। একবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ইসলামি চিন্তার বিকাশ ঘটাতে গবেষণা ও সহায়তার লক্ষ্যে এ প্রতিবেদনে একটি 'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক' (Think Tank)[১৪১] গড়ে তোলার বিষয়েও সুপারিশ করা হয়।

এই প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানটির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সদস্য দেশগুলোকে সময়মত বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক অনুদান প্রদানের কথা বলে। যেসব সদস্য দেশ তাদের বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক অনুদান টানা ৩ বছর দেয়া থেকে বিরত থাকবে তাদের ভোট প্রদান করার ক্ষমতা রোধ করা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা কাটছাঁট করার সুপারিশ করা হয়। আরও বলা হয় যে, অন্যান্য সমমর্যাদার প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ওআইসি ও তার অঙ্গসংগঠনগুলোর কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে বাজেট ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।[১৪২]

---

১৪০. <http//: www.oic_oci.org/ex-summit/english/em-persons-rep.htm>

১৪১. Think Tank হচ্ছে এক ধরনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান যা সামাজিক রীতিনীতি, রাজনৈতিক কৌশল, অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গবেষণা ও আইনি সহায়তা প্রদান করে থাকে। <http:// www.wikipedia.org/wiki/Think_tank>.

১৪২. <http:// www.oic_oci.org/ex-summit/english/em-persons-rep.htm>

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কারের ডাক

২০০৫ সালের ২১ জানুয়ারি হজের সময় দেয়া এক ভাষণে তৎকালীন সৌদি রাজকুমার আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে একত্রিত হওয়ার আহবান জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে মুসলিম বিশ্ব এক দু:খজনক অবস্থায় আছে এবং এ প্রেক্ষিতে সব পর্যায়ে ব্যাপক ও সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়ার পরামর্শ দেন এবং মুসলিম বিদ্বানদের নিয়ে একটি সভা আহবানের প্রস্তাব করেন। ইসলামি বিশ্বের সব অঞ্চলের বুদ্ধিজীবীদের সেই সভায় আমন্ত্রণ জানানোর পক্ষে তিনি মতপ্রকাশ করেন। এই সংস্কার প্রক্রিয়ায় ওআইসি যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে পারে সেটার ওপরও তিনি জোর দেন।

রাজকুমার তার বক্তৃতায় ১০ম ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে মালয়েশিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে এবং ওআইসির মহাসচিবকে মক্কায় একটি বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের আহবান জানান। এই সম্মেলনে শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও পন্ডিতদের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হবে এবং মুসলিম বিশ্ব যাতে করে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারে সে জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় ও পদ্ধতির অনুসন্ধান করা হবে। সৌদি আরবের সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর আহবানে সাড়া দিয়ে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের প্রারম্ভিক সভা ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে এবং বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন একই বছরের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, বুদ্ধিজীবীদের ফোরামটি বহুমাত্রিক দিক থেকে পরিস্থিতি বিবেচনা করবে যেখানে মুসলিম বিশ্বের অবস্থা, প্রয়োজনীয় সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ এবং ঐক্য সংক্রান্ত বিষয়গুলো বিশদভাবে আলোচিত হবে। এর পাশাপাশি আরও যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে তার মধ্যে থাকবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সঙ্কটগুলো।

সাধারণ সচিবালয় মুসলিম বিশ্বের দক্ষ, সুপরিচিত এবং বিশিষ্ট পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের আমন্ত্রণ জানাবার উদ্যোগ নেয়। মুসলিম পন্ডিতদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে তাদের ওআইসির সদস্য দেশগুলোর বাইরে থেকেও আমন্ত্রণ জানানো হবে, যাতে করে মুসলিম বিশ্বের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে যেসব জটিল বিষয়গুলো দায়ী সে সম্পর্কে সর্বোচ্চ ধারণা লাভ করা যায়। এ সম্মেলনে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন এমন বিশেষজ্ঞদের আহবান জানানো হয় যার মাঝে রয়েছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ, ইসলামী আইনবিদ ও গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কমিশনের সদস্যরাও এর মাঝে অন্তর্ভূক্ত হন, যাতে করে তারা তাদের বিবেচনার সাথে এই উদ্যোগকে মেলাতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনটি ৯-১১ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় ১০০ সুপরিচিত পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবী অংশগ্রহণ করে। এই উদ্যোগকে কার্যকরী করার জন্য তিনটি প্যানেল গঠন করা হয়, যাদের প্রতিটি পৃথকভাবে বিভিন্ন প্রস্তাবনা পেশ করে।[১৪৩]

১. রাজনৈতিক ও মিডিয়া প্যানেলের সুপারিশমালা (Panel on Political and Media Issues)

রাজনৈতিক ও মিডিয়া প্যানেলটি সমসাময়িক আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট থেকে মুসলিম বিশ্বের অবস্থানটি পর্যালোচনা করে। প্রথমেই প্যানেলটি পুরোপুরি নিশ্চিত হয় যে, ইসলামি মূল্যবোধ ও সমসাময়িক আন্তর্জাতিক মূল্যবোধের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে সাম্য, ন্যায়, শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের মত মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামনে এগুতে হবে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, মুসলিম বিশ্বে যে দু:খজনক পরিস্থিতি বিদ্যমান, তার অন্যতম কারণ হল কিছু দীর্ঘমেয়াদি সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাওয়া এবং বিভিন্ন নেতিবাচক ও আক্রমণাত্মক প্রচারণা। তারা সেইজন্য পরবর্তী দশকে মুসলিম বিশ্বের পুনর্জাগরণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কিছু বিষয় নির্দিষ্ট করার প্রস্তাব করেন।

যেসব বিষয় সম্পর্কে প্যানেলটি পর্যালোচনা করে তার মাঝে রয়েছে ইসলামি সংহতি বৃদ্ধি, সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা, বিরোধ নিরসন সংক্রান্ত উদ্যোগ এবং প্রস্তাবনা, সন্ত্রাসবাদ, বিশ্বায়ন এবং ওআইসি ও তার অঙ্গসংগঠনগুলোর সংস্কার ও পুনর্গঠনের মত বিষয়গুলো। এটি আরও পর্যালোচনা করে ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে পশ্চিমা গণমাধ্যমের ভূমিকা, ইসলামাতঙ্ক, আন্ত:সভ্যতা সংলাপ এবং বিশেষ করে ওআইসির সদস্য দেশগুলোর বাইরে অবস্থানকারী সংখ্যালঘু মুসলমানদের রাজনৈতিক ও মানবাধিকারের বিষয়টি। এছাড়া ফিলিস্তিন প্রসঙ্গসহ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিস্তৃতিকরণের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের কার্যকরী ভূমিকার ওপর প্যানেলটি গুরুত্বারোপ করে যাতে করে মুসলমানরা বিশ্ব প্রেক্ষাপটে নিজেদেরকে আরও ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারে। এইসব ইস্যুতে প্যানেলটি বিভিন্ন যৌক্তিক সুপারিশমালা পেশ করে যাতে করে সদস্য দেশগুলো আরও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

২. অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত প্যানেলের সুপারিশমালা (Panel on Economy, Science and Technology Issues)

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং জনসম্পদের প্রাচুর্যের কথা মাথায় রেখে প্যানেলটি কিছু চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে যা স্বল্পমেয়াদি সময়ে সংস্কার করতে হবে। এসব প্রতিবন্ধকতাগুলোর মাঝে রয়েছে–অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ, বেসরকারি ক্ষেত্রের দুর্বল অবস্থা,

---

১৪৩. <http:// www.oic_oci.org/ex-summit/english/sg-report.htm>

Dhaka University Institutional Repository

টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ব্যর্থতা, বিনিয়োগের হার হ্রাস, অপর্যাপ্ত বাণিজ্য বিনিয়োগ, বৈদেশিক ঋণের ভারি বোঝা এবং ঋণ প্রক্রিয়া ও অনুদানের ক্ষেত্রে প্রবল অসামঞ্জস্য, বাজারে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত সমস্যা। এইসব প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও দক্ষ পরিবহন ব্যবস্থার অভাব, দারিদ্র্য ও রোগব্যাধি, মৌলিক চাহিদার অপ্রতুলতা, সামর্থ্যগত অভাব, কাঠামোগত অপ্রতুলতা ও অদক্ষ জনশক্তিগত দিক থেকে কিছু সদস্য দেশ ভুগছে।

প্যানেলটি আরও কিছু প্রস্তাব উপস্থাপন করে যার মাঝে রয়েছে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট সৃষ্টি করা এবং নতুন বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে দেশগুলোকে পরিচালনা করা। এর প্রথম ধাপ হিসেবে অর্থনৈতিক সংহতি সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্যিক ক্ষেত্র তৈরি করার প্রস্তাব করা হয়। এটি ওআইসি সদস্য দেশগুলোর মাঝে বাণিজ্য সম্প্রসারণের আহবান জানায় এবং ২০১৫ সালের মধ্যে আন্ত:ওআইসি বাণিজ্যের হার শতকরা ১৩ ভাগ থেকে ২০ ভাগে উন্নীত করার কথা বলে।[১৪৪] প্যানেলটি মানবিক সহায়তার লক্ষ্যে একটি তহবিল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে Islamic Chamber of Commerce and Industry (ICCI) এবং Islamic Development Bank (IDB) এর কার্যক্রম বৃদ্ধির কথাও বলে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মাঝে ছিল–জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কৌশলগত অপ্রতুলতা এবং গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অপ্রতুল কাঠামো। প্যানেলটি দ্বারা কিছু লক্ষ্যমাত্রা চিহ্নিত করা হয় যার মাঝে রয়েছে এই দশকের শেষের মধ্যেই জনসংখ্যার প্রতি দশ লাখ জনগণের মাঝে ৮০০ জন গবেষক, প্রকৌশলী এবং বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষিত করে তোলা এবং ১৮-২৪ বছর বয়সী শতকরা ৩০ ভাগ মুসলিম ছাত্রদের ২০১৫–এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা, গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় ১.২% এ উন্নীত করা।[১৪৫] এছাড়া ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশগুলো থেকে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের শীর্ষ ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করা।

---

[১৪৪]. They welcomed the proposal to achieve a 20% level in intra-OIC trade by the year 2015. বিস্তারিত: <http:// www.oic_oci.org/ex-summit/english/sg-report.htm>

[১৪৫]. The scholars recommended that OIC countries should set targets and specific indicators to be achieved in the long and medium terms. Accordingly, the Scholars proposed the following targets for the year 2015: (a) number of expert and scientist 800 per million, (b) ratio of student between ages 18 and 24 having the opportunity to enter into universities: 30% (c) number of students to professor: 16 (d) percentage of GDP for R&D: 1.2%. বিস্তারিত: <http:// www.oic_oci.org/ex-summit/english/sg-report.htm>

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইসলামি চিন্তা, সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত প্যানেলের সুপারিশমালা (Panel on Islamic Thought, Culture & Education)

ইসলামি চিন্তধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক বিবেচনা করে প্যানেলটি তেরটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করে, যা মুসলিম সমাজের উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করছে। প্যানেলটি ইসলামে সংযমের গুরুত্ব, ইসলামি চিন্তাধারার বহুমাত্রিকতা ও বিশেষ করে ধর্মীয় নীতি পদ্ধতি সম্পর্কে ইসলামী ফিক্‌হ অ্যাকাডেমি কতৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে। প্যানেলটি আরও গুরুত্বারোপ করে–নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও উচ্চশিক্ষার প্রসার, সংহতি বৃদ্ধি, নারী ও শিশু অধিকার, মুসলিম যুবসমাজের উন্নয়ন, আন্তঃসভ্যতা সংলাপ এবং ওআইসির সদস্য দেশ নয় এমন দেশে অবস্থানকারী মুসলিম সম্প্রদায়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে সহায়তা প্রদানের বিষয়টি। প্যানেলটি মনে করে যে যদি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়গুলোতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিশ্চিত করা যায় তবে মুসলিম বিশ্বে নবজাগরণ আনা সম্ভব। তারা ওআইসির কৌশলগুলো নিয়ে নির্দিষ্ট সময় পর পর পর্যালোচনার ওপরও জোর দেয়।

বিশেষ মক্কা শীর্ষ সম্মেলন

২০০৫ সালের ডিসেম্বরে বিশেষ মক্কা শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ওআইসির সদস্য দেশগুলোর অধিকাংশ প্রধান নেতা অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে সৌদি বাদশাহ ঐক্যবদ্ধ ইসলামি উম্মাহর জাগরণের আকাঙ্ক্ষা, অন্যায় ও শোষণ অপসারণে আইনের প্রয়োগ, সামগ্রিক ইসলামি উন্নয়ন যার উদ্দেশ্য হল দুর্নীতি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, ইসলামের সহিষ্ণুতার বৈশিষ্ট্য ও যুক্তির প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে তার সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেন:

> মুসলিম উম্মাহ কোনভাবেই আর নিজস্ব সঙ্কটগুলোকে উপেক্ষা করার মত অবস্থায় নেই। আজ যেসব কারণে তাদের এই দুর্দশা, সেগুলোকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করে অবশ্যই সামগ্রিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে। সাথে সাথে উন্নয়ন সম্ভাবনা সৃষ্টির পাশাপাশি ইসলামের প্রকৃত ভাবমূর্তি ও এর মানবতাবাদী মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে হবে।[১৪৬]

দুই দিনের এই শীর্ষ সম্মেলনে মুসলিম উম্মাহর নেতৃবৃন্দরা একমত হন যে, একমাত্র মৌলিক পরিবর্তনই পারে মুসলিম বিশ্বের উন্নতি ঘটাতে এবং এই মৌলিক পরিবর্তন আসতে পারে

---

[১৪৬]. The Muslim Ummah could not longer be in a state of denial and that the causes for the miserable conditions in which it finds itself today must be confronted and addressed in a holistic manner, inter alia, through building capabilities as well as the projection of the true image of Islam and its civilization approaches. বিস্তারিত: <http://www.oic_oci.org/ex-summit/english/em-persons-rep.htm>

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিশ্বের প্রকৃত পুনর্গঠন এবং আমাদের চিন্তাধারা কর্মকান্ডকে পরিবর্তনের মাধ্যমে। শীর্ষ সম্মেলনে দশসালা পরিকল্পনার পাশাপাশি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কমিশনের সুপারিশমালাও গৃহীত হয়।[১৪৭]

বিশেষ মক্কা শীর্ষ সম্মেলনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও প্রায় সাথে সাথে শুরু হয় যার মাঝে রয়েছে–দারিদ্র্য উন্নয়ন তহবিল সৃষ্টি এবং সদস্য দেশগুলোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকে নিজ নিজ দেশের জিডিপির কমপক্ষে শতকরা ১ ভাগে উন্নীত করা। সম্মেলনে Islamic Development Bank (IDB) ও ওআইসির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার বিষয়ে গঠিত স্থায়ী কমিটির (COMSTECH) মধ্যকার সমন্বয় ও সহযোগিতা আরও দৃঢ় করার ওপরও গুরুত্ব দেয়া হয়।

কার্যকরী সংস্কার

২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত মুসলিম পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের সভায় গৃহীত সুপারিশমালার ওপর ভিত্তি করে ওআইসির সাধারণ সচিবালয় একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে এবং দশসালা পরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে। এর মাঝে রয়েছে ওআইসির মহাসচিবকে দেয়া যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষমতা, সংস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা ও এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ দেয়ার বিষয়টি, যাতে করে তিনি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন।

সংস্কার প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর জোর দেয়া হয়:[১৪৮]

১. সনদ পর্যালোচনা ও সংশোধন;
২. একটি কার্যনির্বাহী কমিটি তৈরি করা যাতে জরুরি বিষয়ে দ্রুত ও তৎপরভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়;
৩. ইসলামি ফিক্‌হ অ্যাকাডেমি পুনর্গঠন;
৪. আন্তর্জাতিক ইসলামি সংবাদ সংস্থা এবং ইসলামি সংহতি তহবিল পুনর্গঠন;
৫. দারিদ্র্য উন্নয়ন তহবিল প্রতিষ্ঠাকরণ;
৬. বিশ্ব পর্যায়ে ওআইসির রাজনৈতিক উপস্থিতি আরও জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করা;
৭. ওআইসিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকান্ডে আরও কার্যকরী করা।

---

[১৪৭]. *The Europa World year Book*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৬।

[১৪৮]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ পুনর্বিবেচনা

১৯৬৯ সালে ওআইসি প্রতিষ্ঠার পর প্রথম তিন বছর সংস্থাটির কোন সনদ ছিল না। ১৯৭২ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে সংস্থাটির সনদ গৃহীত হয়।[১৪৯] গৃহীত হওয়ার পর থেকে কিছু কাল ধরে সনদটি সদস্য দেশগুলোর মাঝে সমন্বয় ও সংহতি সাধনে সমর্থ হয় এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এর ফলে ওআইসি গঠনের পর পরই নিত্য নতুন অঙ্গসংগঠন ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। পরবর্তীতে পরিবর্তনশীল বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য ওআইসির সংস্কারের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং এ প্রেক্ষিতে সনদের পুনর্বিবেচনা ও অন্যান্য সব কর্মকান্ডের নিরীক্ষণের জন্য দাবী উঠতে থাকে।

বলাবাহুল্য যে সনদ পুন:সংশোধন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য নতুন সনদের মূল স্তম্ভগুলো চিহ্নিত করা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণা অর্জনের জন্য ২০০৫ সালে ওআইসির তৎকালীন মহাসচিবের নেতৃত্বে ও সদস্য দেশগুলোর মতামত বিবেচনায় একটি উচ্চ পর্যায়ের পরামর্শক প্যানেল (High Level Advisory Panel) গঠন করা হয়। প্যানেলটি গঠিত হয় অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ দ্বারা, যাদের আন্তর্জাতিক বিষয়ে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্যানেলটিতে ছিলেন–তুরস্কের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সোলেমান ডেমিরেল, মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির বিন মুহাম্মদ, ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী আল আতাস, ওআইসির প্রাক্তন মহাসচিব হামিদ আল গাবিদ, গালফ সহযোগী কাউন্সিলের প্রাক্তন মহাসচিব জামিল আল হুয়ানলান, ইউনেস্কোর প্রাক্তন কার্যনির্বাহী পরিচালক আমাদু মোক্তার এমবাউ, আন্তর্জাতিক আদালতের প্রাক্তন বিচারক ও বর্তমান আরব লীগের মহাসচিব ড. নাবিল আল আরাবি এবং জাতিসংঘের প্রাক্তন উপ-মহাপরিচালক লাখদার ব্রাহিমি (যিনি সভার সমাপনী অধিবেশনে যোগদান করেন)। ২০০৬ সালের মে তে ইস্তাম্বুলে এবং ডিসেম্বরে জেদ্দায় প্যানেলটি দু'বার মিলিত হয়।[১৫০] প্যানেলটির দুটি সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে তাদের বিবেচনার জন্য একটি খসড়া প্রস্তাবনা তৈরির লক্ষ্যে সাধারণ সচিবালয় পর্যায়ে বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ খসড়া তৈরি করতে গিয়ে জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং আরব লীগের মত বিভিন্ন আন্ত:রাষ্ট্রীয় সনদ বিবেচনা করা হয়।

---

১৪৯. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২।

১৫০. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

সনদ পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত পরামর্শক প্যানেলের সুপারিশ

প্রেসিডেন্ট ডেমিরেলের মতে, জটিল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ওআইসির পুনর্গঠন এক অত্যন্ত জরুরি বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানটির পরিপূর্ণ সংস্কার প্রয়োজন। এছাড়া তিনি সদস্য দেশগুলোর মাঝে সংহতি ও সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি সুপারিশ করেন যেন নতুন সনদটি আন্তর্জাতিক আইনের মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে এবং জাতিসংঘের সনদে প্রতিফলিত নীতি ও ধারাগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত হয়। এ ধারাগুলোর মাঝে রয়েছে আইনের শাসন, মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং শান্তি ও সমতা ও এর সাথে রয়েছে ইসলামী মূল্যবোধ। তিনি আরও বলেন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে সংহতি ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা, সন্ত্রাসবাদ, ইসলামাতঙ্ক এবং বৈদেশিক আগ্রাসন, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যভিত্তিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং সদস্য দেশগুলোর মাঝে তথ্য বিনিময়, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্ষুধা নিবারণ করা। তার মতে, সনদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধকে তুলে ধরা এবং সাধারণ ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী সংরক্ষণ করা। তিনি নারীর ক্ষমতায়ন ও যুবসম্প্রদায়ভিত্তিক সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ধারণাকে সমর্থন করেন। তার মতে, ওআইসি সদস্যভুক্ত নয় এমন দেশে বসবাসকারী মুসলিম সংখ্যালঘুদের অবশ্যই তাদের পরিচয়কে সংরক্ষণ করার অধিকার থাকা উচিত। তিনি বিদ্যালয়গুলোতে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি পড়ানোর বিষয়টির ওপরও গুরুত্ব প্রদান করেন।

ড. মাহাথির বিন মুহাম্মদ মনে করেন যে, পশ্চিমা ও ইসলামি মূল্যবোধের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করা উচিত। তিনি বিশ্বায়নের বিষয়ে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করে বলেন যে, সুশাসনের ধারণা মুসলিম বিশ্বের মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংজ্ঞায়িত করা উচিত। কারণ ইসলামের সুশাসনের ধারণার সাথে পশ্চিমা বিশ্বের গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা সবসময় মিল খায় না। মুসলিম বিশ্বের চাহিদা অনুসারে আরও বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ গণমাধ্যম স্থাপনের পাশাপাশি তিনি প্রস্তাব রাখেন যে, মুসলিম দেশগুলোর উচিত উৎকর্ষতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আরও বেশি করে বিনিয়োগ করা যাতে করে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে মেধা উল্টো মুসলিম বিশ্বে আসে। যার জন্য তিনি মুসলিম বিশ্বের গবেষণাকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অমুসলিমদের নিয়োগ প্রদানের কথা বলেন। তিনি দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিনিয়োগের পাশাপাশি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনধারায় পরিবর্তন আনার জন্য ওআইসিকে দরিদ্রবান্ধব নীতিমালা গ্রহণের কথা বলেন। এছাড়া তিনি ওআইসি মহাসচিবকে আরও ক্ষমতা প্রদানের কথা বলেন যাতে করে তিনি ওআইসির সংস্কারকার্য সম্পাদনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন এবং মহাসচিবের মেয়াদকাল পাঁচ বছরে উন্নীত করার ব্যাপারে তিনি সুপারিশ করেন। ওআইসির সদস্য দেশগুলো থেকে যে কোনো দেশকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়া প্রসঙ্গে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

জামিল আল হুয়ানলান মনে করেন, একটি সনদ যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে পারে যদি সদস্য দেশগুলোর শক্তিশালী রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সমর্থন থাকে। তিনি মনে করেন ওআইসির সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়ন করা প্রায়শই বাধাগ্রস্ত হয় যা প্রতিষ্ঠানটির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে।

আলী আল আতাস প্রস্তাব করেন যে, নতুন সনদটিতে কিছু বিশেষ ইস্যুতে ভোটাধিকার প্রয়োগে সদস্য দেশগুলোর অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করতে কিছু নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকবে। তিনি আরও প্রস্তাব করেন যে সনদে বাজেটগত ও অন্যান্য বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে সদস্য দেশগুলোর অঙ্গিকার পর্যবেক্ষণ করা এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে শাস্তিমূলক অবরোধ আরোপের প্রক্রিয়াও থাকবে। তিনি অন্যান্য প্যানেলের সদস্যদের সাথে একমত হয়ে সাধারণ সচিবালয়ের অর্থনৈতিক সহায়তা বৃদ্ধির পক্ষে মতপ্রকাশ করেন।

ড. হামিদ আল গাবিদ প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে 'মুসলিম বিশ্ব প্রতিষ্ঠান' বা 'মুসলিম দেশগুলোর প্রতিষ্ঠান' করার প্রস্তাব করেন। তিনি সনদটিতে ধর্মীয় সহিংসতা ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিষয়টি সংযুক্ত করার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। এর সাথে তিনি প্রস্তাব করেন যে, ওআইসির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণ করার জন্য প্রতি পাঁচ বছর পর পর মুসলিম পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের মিলিত হওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক ফিক্‌হ অ্যাকাডেমির কর্মপরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি বিশেষায়িত কমিটিগুলো যেমন–COMCEC, COMIAC এবং COMSTECH-এর সহযোগিতা সম্পর্কে ড. গাবিদের জোরালো মত হল এ কমিটিগুলো যেসব দেশে অবস্থিত, সেগুলোর ওপর বোঝা না হয়ে অন্য সদস্য দেশগুলোর উচিত এগুলোকে অর্থসাহায্য প্রদান করা। তিনি সংস্থার সহায়তার জন্য একটি স্থায়ী ও টেকসই অর্থনৈতিক উৎস স্থাপনের পাশাপাশি সদস্য দেশগুলোর দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ইসলামি সংহতি তহবিলের মূলধন বৃদ্ধিতেও তিনি জোর দেন।

ড. নাবিল আল আরাবি জাতিসংঘের সনদটিকে মডেল হিসেবে নেয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন যে ওআইসির সাধারণ সচিবালয়ের কর্মসূচি নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত যাতে করে প্রতিষ্ঠানটি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারে। আল আরাবি মনে করেন সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা ও গণতন্ত্র নতুন সনদটির মূলনীতি ও লক্ষ্য হওয়া উচিত কারণ সনদে এইসব মূল্যবোধের অনুপস্থিতি বর্হিবিশ্বের কাছে ইসলামের এক অপ্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছে। তিনি বলেন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে পার্থক্য এবং অন্যান্য সংস্থার সাথে ওআইসির বিশেষ পার্থক্যের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত। সবশেষে, তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের পিছিয়ে পড়া নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদু মোক্তার এমবাউ পরামর্শ দেন মহাসচিবের ক্ষমতায়নের ওপর, যার ওপর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত থাকে। তিনি বলেন যে মহাসচিবের ওপর অঙ্গসংগঠনগুলোর কার্যক্রম সমন্বয়ের ভার ন্যস্ত করা উচিত। এছাড়া বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর অবস্থান মহাসচিবের মাধ্যমে সমন্বিত হওয়া উচিত এবং ওআইসি গোষ্ঠীর জাতিসংঘের আওতাধীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সহযোগী হিসেবে অংশ নেয়ার লক্ষ্যে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। তার মতে মহাসচিবের অবশ্যই বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ইউনেস্কো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, মানবাধিকার কমিশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত থাকার ব্যবস্থা সনদে অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন। তিনি মনে করেন যে, সাধারণ সচিবালয়ের সব ধরণের নিয়োগের ক্ষেত্রে মহাসচিবের সর্বময় ক্ষমতা থাকা উচিত তবে তা মন্ত্রী পর্যায়ের সভার পরামর্শক্রমে হতে পারে। তিনি আরও বলেন, মহাসচিবকে অবশ্যই প্রয়োজন অনুসারে পরামর্শক এবং খন্ডকালীন কর্মচারী ও সাথে সাথে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা উচিত।

সনদ পুনর্বিবেচনা সংক্রান্ত আইনজীবী কমিটির সুপারিশ

উচ্চ পর্যায়ের পরামর্শক প্যানেল কর্তৃক সুপারিশমালা প্রাপ্তির পর আইনগত দিক থেকে একটি নিখুঁত দলিল তৈরি করার মানসে বিশিষ্ট আইনবিদদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় ওআইসির প্রাক্তন মহাসচিব পাকিস্তানের সৈয়দ শরফুদ্দিন পীরজাদাকে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন–আন্তর্জাতিক আইন সংস্থার সদস্য ইন্দোনেশিয়ার নুগরোহো উইসনুমুরতি, ইরানের পক্ষ হতে জাতিসংঘের প্রাক্তন স্থায়ী প্রতিনিধি জাবেদ জারিফ এবং সেনেগালের প্রফেসর বাবাকার সুয়ে। কমিটিটি ২০০৭ সালের ৩ ও ৪ মার্চ জেদ্দায় মিলিত হয় এবং একটি খসড়া তৈরি করে যা সকল সদস্য দেশের মাঝে বিতরণ করা হয় এবং ওআইসি উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সভায় ২০০৭ সালের ১৪-১৬ এপ্রিল উপস্থাপন করা হয়।

মক্কা শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সনদের পুন:সংশোধনের লক্ষ্যে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া একটি আন্ত:রাষ্ট্রীয় বিশেষজ্ঞ দল গঠনের। দলটি আগ্রহী সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠন করা হয় এবং ২০০৭ সালে ৬-১০ মে জেদ্দায় প্রথমবারের মত মিলিত হয়। তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সামঞ্জস্য বিধানের মানসিকতা নিয়ে বিভিন্ন উপায় ও বিধি পর্যালোচনা করে এবং সনদটির বিভিন্ন শর্ত ও ধারার বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছাতে সমর্থ হয়। যদিও প্রথম সভায় সনদের পর্যালোচনা শেষ করা সম্ভবপর হয়নি, কারণ কাজটি ছিল বেশ কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞ কমিটির আলোচনার ফলাফল ও প্রস্তাবনা ২০০৭ সালের ১৫-১৭ মে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের ৩৪তম সম্মেলনের পূর্বে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সভায় উপস্থাপন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্মেলনে কিছু সদস্য দেশ মনে করে বিশেষজ্ঞ দলটির খসড়াটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন এবং এ প্রেক্ষিতে সনদটি পুনর্বিবেচনার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ দলটির মিলিত হওয়ার জন্য আরেকটি গ্রহণযোগ্য সময় নির্ধারণ করতে মহাসচিবকে অনুরোধ করেন। বেশ কিছু আফ্রিকান সদস্য দেশ কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের মতামত পেশ করে। ওআইসি সম্মেলনের পরবর্তী সভাপতিত্বকারী দেশ হিসেবে সেনেগাল নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং অন্য সদস্য দেশের সাথে মিলে বিভিন্ন মতামতগুলো সমন্বয় সাধনের কাজটি খুব সুন্দরভাবে করতে সমর্থ হয়। তারা ২০০৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বর রাজধানী ডাকারে শুধু আফ্রিকান সদস্য দেশগুলোর সমন্বয়ে একটি সভার আহবান করে। উক্ত সভায় আফ্রিকান গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠানটির নামে কোনো পরিবর্তন না আনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে তারা ওআইসির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বার্ষিক যে সভা অনুষ্ঠিত হয় সেটার নাম 'ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভা' থেকে পরিবর্তন করে 'পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের পরিষদ' রাখার প্রস্তাব করে।

আফ্রিকান দেশগুলোর সভার পর পরই ১০–১৩ সেপ্টেম্বরে বিশেষজ্ঞ দলের আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় জেদ্দায়। এ সভায় বেশিরভাগ বিষয়েই তারা ঐকমত্যে পৌঁছতে সমর্থ হন। তবে কিছু রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় মুলতবি থাকে, যার মাঝে ছিল– ওআইসির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার, ওআইসিতে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা অর্জন সংক্রান্ত বিষয় এবং সনদের স্বাক্ষর ও অনুমোদন সংক্রান্ত বিধিমালা। ফলশ্রুতিতে ৩–৫ নভেম্বর বিশেষজ্ঞ দলটি পুনরায় জেদ্দায় মিলিত হয়। দীর্ঘ আলোচনার পরও বিদ্যমান ইস্যুগুলোতে ফলপ্রসু কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। সিদ্ধান্তগুলো অমীমাংসিত থেকে যাওয়ায় ২০০৮ সালের ৫-১০ জানুয়ারি বিশেষজ্ঞ দলটি আবারো মিলিত হয়। এবারও সভাতে বিদ্যমান ইস্যুগুলো নিয়ে কোন মীমাংসা করা সম্ভব না হওয়ায় সিদ্ধান্ত নেয় হয় যে, বিষয়টি নিয়ে একটি প্রতিবেদন ডাকারে অনুষ্ঠিতব্য একাদশতম ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ও মন্ত্রী পর্যায়ের প্রস্তুতিমূলক সভায় পেশ করা হবে। কিন্তু শীর্ষ সম্মেলনের স্বাগতিক দেশ সেনেগাল শীর্ষ সম্মেলনের শীর্ষ সম্মেলনের পূর্বেই দুটি আলাদা অধিবেশনে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সভা সেরে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

সনদ সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রথম অধিবেশনটি হয় ২০০৮ সালের ১৮–২০ ফেব্রুয়ারি সালি পর্তুগালে (সেনেগাল)। সভায় সেনেগাল বিভিন্ন মতপার্থক্যগুলোকে সমন্বয় সাধনের জন্য তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা প্রয়োগ করে। অচলাবস্থা কাটাতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সভাটিতে সামান্য অগ্রগতি সাধিত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালের ৮ মার্চ সেনেগালের রাজধানী ডাকারে। আবারও বিদ্যমান ইস্যুগুলো অমীমাংসিত থেকে যায় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এসব বিষয়গুলো সম্মেলনের প্রস্তুতিমূলক মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় তুলে ধরা হবে। মন্ত্রী পর্যায়ের সভায় প্রবল মতপার্থক্য তৈরি হয় মূলত সনদের স্বাক্ষর ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া নিয়ে। সেনেগালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. টিডিয়ান গাদিয়ো, যিনি সভায় সভাপতিত্ব করেন, তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

কূটনৈতিক দক্ষতা দিয়ে অন্যান্য দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মতপার্থক্য সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে দীর্ঘ আলোচনার পর ড. গাদিয়ো তার সহযোগী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রতি একটি দীর্ঘ ও আবেগপূর্ণ আবেদন রাখেন যেন তারা মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থাটা অনুধাবন করেন। তিনি তাদের আরেকটু নমনীয় হওয়ার আহবান জানান যাতে করে সনদ সংশোধনের এ অপূর্ব সুযোগ নষ্ট না হয়ে যায়। এ আবেদন একটি ইতিবাচক মনোভাবের জন্ম দেয় এবং দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থানের বরফ গলতে শুরু করে। শীর্ষ সম্মেলনের সভাপতি ও সেনেগালের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ ওয়াদে, যিনি তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতা ও সমঝোতা সংক্রান্ত কৌশলের পূর্ণ প্রয়োগ করে সব মুলতবি বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপনে সমর্থ হন। নতুন সনদটি সর্বসম্মতিক্রমে ২০০৮ সালের ১৪ মার্চ একাদশতম শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত হয়।[১৫১]

এ সনদ ওআইসি ও এর সদস্য দেশগুলোর জন্য এক নতুন যুগের সূচনা করে। এ সনদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো ধারায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার রক্ষা, এবং আন্তর্জাতিক সাধারণ মূল্যবোধগুলোর সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এ সনদে সদস্য দেশগুলোর বাইরে বসবাসরত ক্ষুদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ওআইসি সনদের এ দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর মানবাধিকার সংক্রান্ত কার্যক্রম ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিল পত্রাদিতে বিবৃত মানবাধিকার সংক্রান্ত মূল্যবোধগুলোর সাথে সামঞ্জস্য বিধানের পথে এক বিশাল পদক্ষেপ।

এ নতুন সনদে একটি স্বাধীন স্থায়ী মানবাধিকার কমিশনকে সংস্থার অঙ্গসংগঠন হিসেবে মর্যাদা প্রদানের মাধ্যমে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়াবলির গুরুত্বকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। এ কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে কয়েকজন বিশিষ্ট মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এক বৈঠকে মিলিত হন। আর এর মাধ্যমেই সূচিত হয় এই কমিশন স্থাপনের প্রথম ধাপ। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কমিশনের দিকনির্দেশনা, আওতা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণের মাধ্যমে এর ভিত্তি স্থাপন করার।

ইসলামে নারী অধিকার সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কখনই কোনো বাধা ছিল না। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নারী অধিকার চর্চা বা নারীর প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ নেই। গত শতাব্দীর শুরু থেকেই বিভিন্ন মুসলিম সমাজব্যবস্থায় সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টি বিশেষ করে নারী অধিকার রক্ষার প্রেক্ষিতে আলোচিত হচ্ছে। তুরস্ক, মিসর, তিউনেশিয়া, আলজেরিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ইরান ও বাংলাদেশসহ বহু মুসলিম দেশেই নারী অধিকার রক্ষায় পর্যাপ্ত আইন রয়েছে।

---

[১৫১]. *The Europa World year Book, ibid,* p. 416.

Dhaka University Institutional Repository

ওআইসি সংস্কার ব্যবস্থার একটি অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে এর সদস্য দেশগুলোতে নারীর মর্যাদা বাড়িয়ে তোলা এবং নারী ক্ষমতায়নের মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের নারী সমাজের প্রাপ্য সুবিধাদি আমাদের নারী সমাজের জন্য নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে ওআইসি বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের পেছনে মূল প্রেরণা যুগিয়েছে ওআইসির সনদে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ একটি লক্ষ্য–নারী অধিকার উন্নয়ন এবং শক্তিশালী করার মাধ্যমে জীবনের সবক্ষেত্রে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে ওআইসি এর ভূমিকা

১ম পরিচ্ছেদ:

মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ওআইসি এর ভূমিকা

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে ওআইসি একটি রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু সহসাই বুঝা গেল যে, যৌথ রাজনৈতিক উদ্যোগকে সফল ও কার্যকর করতে গেলে একটি বিস্তৃত সহযোগিতার ক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করতে হবে, যার মাঝে যৌথ অর্থনৈতিক উদ্যোগের বিষয়টিও রয়েছে। ১৯৭০ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের প্রথম সম্মেলনে এ লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অংশগ্রহণকারী দেশের সরকারেরা পরস্পরের সাথে অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সাহায্য বৃদ্ধিতে যোগাযোগ রক্ষা করবে।[১৫২]

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মুসলিম বিশ্বে সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, প্রাতিষ্ঠানিক, প্রযুক্তি ও অর্থনীতিভিত্তিক কর্মকান্ডে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে ওআইসির অঙ্গসংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় ইসলামি সংহতি তহবিল (Islamic Solidarity Fund-ISF)। একই বছর ওআইসির বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank-IDB)। এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য ছিল সদস্য দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং অর্থসংস্থান করার মাধ্যমে দেশগুলোর বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত করা। এমনিভাবে মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার লক্ষ্যে পরবর্তীতে ওআইসির বেশ কিছু অঙ্গসংগঠন ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে, যাতে করে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়।

---

[১৫২]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

❖ ইসলামি সংহতি তহবিল (ISF)

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ইসলামি সংহতি তহবিল (Islamic Solidarity Fund-ISF) এর অগ্রযাত্রা শুরু হলেও এর কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৬ সালে কিছু সদস্য রাষ্ট্রের অনুমোদনের মাধ্যমে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি বিশ্বে সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, প্রাতিষ্ঠানিক, প্রযুক্তি ও অর্থনীতিভিত্তিক কর্মকান্ডে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। ১৯৮০ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ১১তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে তহবিলের অর্থনৈতিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে একটি বিশেষ 'ওয়াকফ' গঠন করা হয়। তবে এই 'ওয়াকফ' এর চাঁদা প্রদানের বিষয়টি সদস্য দেশগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না।[১৫৩] এই তহবিলের উৎস ছিল সদস্য দেশের ঐচ্ছিক চাঁদা, রাষ্ট্রীয় বা বেসরকারি অথবা ব্যক্তিগত দান ও অনুদান এবং ওয়াকফ এর আয়। এর সদর দফতর সৌদি আরবের জেদ্দায়। ওআইসির মহাসচিব নিয়োজিত একজন নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক পরিচালিত ইসলামি সংহতি তহবিল সদস্য দেশগুলোর বিভিন্ন মানবিক বিপর্যয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন, বিভিন্ন ইসলামি গবেষণা, সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যেসব উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে তা হল-

- প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ন্যায় জরুরী প্রয়োজনে পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা প্রদান;
- মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক মান উন্নয়নে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।[১৫৪]

❖ ইসলামি দেশসমূহের পরিসংখ্যান, অর্থনৈতিক, সামাজিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (SESRIC)

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে ১ জুন ১৯৭৮ সালে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় ইসলামি দেশসমূহের পরিসংখ্যান, অর্থনৈতিক, সামাজিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Statistical, Economic, Social Research and Training Centre for Islamic Countries-SESRTCIC) যাত্রা শুরু করে। ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে আঙ্কারায় অনুষ্ঠিত পরিচালক পর্ষদের ২৯তম সভায় কেন্দ্রের নামের সংক্ষিপ্ত

---

১৫৩. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

১৫৪. To take all possible steps to raise the intellectual and moral levels of the Muslims in the world; To provide required material relief in case of emergencies such as natural catastrophes and man-made disasters, that may befall the Islamic States; To grant assistance to Muslim minorities and communities so as to improve their religious, social and cultural standards; <http:// www.oic-oci.org/subsidiary institution>.

Dhaka University Institutional Repository

রূপ SESRTCIC থেকে পরিবর্তন করে SESRIC করা হয়। এই সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে ২০০৮ সালে ডাকারে অনুষ্ঠিত ১১তম শীর্ষ সম্মেলনে অনুমোদিত হয়। সদস্য দেশসমূহের কৃষি, শিল্প, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং শ্রম সহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রচার, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে SESRIC তার লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসর হয়।[১৫৫]

শুরু থেকেই কেন্দ্রটি সদস্য দেশসমূহে গবেষণালব্ধ অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাত্ত প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে থাকে। এটি সদস্য দেশসমূহের প্রয়োজন অনুসারে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরও আয়োজন করে। এসব কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী ও প্রশাসনিক কর্মশক্তিকে আরও উন্নত ও দক্ষ করে গড়ে তোলা। কেন্দ্রের গবেষণা ও প্রশিক্ষণকর্ম সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির নতুন পথ উন্মুক্ত করে। ১৯৮১ সালের তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে অনুমোদিত সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক সহযোগিতা শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার অধীনে কেন্দ্রটি মন্ত্রী ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের বিভিন্ন সভা আয়োজন করে থাকে। এর অন্যতম প্রধান একটি দায়িত্ব হচ্ছে সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বহি:অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রটি "Project Evaluation and Management" নামে প্রথমবারের মত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে। এছাড়া ১৯৮২ সালে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে "Project Preparation and Evaluation for Agricultural and Rural Development" নামে এবং ১৯৮৩ সালে "National Income and Input-Out Analysis" নামে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে।[১৫৬]

❖ ইসলামি বাণিজ্য উন্নয়ন কেন্দ্র (ICDT)

১৯৮১ সালের তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ইসলামি বাণিজ্য উন্নয়ন কেন্দ্র (Islamic Centre for the Development of Trade-ICDT) অনুমোদিত হলেও ১৯৮৩ সালে মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কায় এর প্রকৃত কার্যক্রম শুরু হয়। সদস্য দেশসমূহের বার্ষিক নিয়মিত চাঁদা ছাড়াও ICDT-এর সেবা প্রদান খাত হতে প্রাপ্ত আয় ও অনুদান ICDT-এর বাজেটের উৎস। এর মূল উদ্দেশ্যগুলোর মাঝে রয়েছে-[১৫৭]

---

১৫৫. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

১৫৬. Inamullah Khan, ibid, P. 731.

১৫৭. প্রাগুক্ত, ৭৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

- সদস্য দেশগুলোর মাঝে বাণিজ্য বিনিময় নিয়মিতকরণে উৎসাহ প্রদান;
- সদস্য দেশের পণ্যসমূহের বিদেশি বাজারে প্রবেশের বিষয়ে উৎসাহ প্রদান ও সহায়তাকরণ;
- বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যের প্রচার ও প্রসার;
- বাণিজ্য প্রসার ও আন্তর্জাতিক দরকষাকষির ক্ষেত্রে সদস্য দেশকে সহায়তা প্রদান এবং
- আন্তর্জাতিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান।

❖ ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)

১৯৭০ সালে পাকিস্তান ও মিসর একটি ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুটি পৃথক প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে। করাচিতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে প্রস্তাব দুটি বিবেচনার পর এ প্রসঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা চালানোর দায়িত্ব প্রদান করা হয় মিসরের ওপর। মিসর এই সমীক্ষা প্রতিবেদন ১৯৭২ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে উপস্থাপন করে। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালে দ্বিতীয় অর্থমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে জেদ্দাভিত্তিক ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank-IDB) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০ অক্টোবর ১৯৭৫ সালে ইসলামি শরীয়ার ভিত্তিতে সদস্য দেশ ও অসদস্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে IDB তার কার্যক্রম শুরু করে।[১৫৮] ওআইসিভুক্ত ৫৬টি দেশ এর সদস্য।[১৫৯] এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ব্যাংকটি যেসব ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার প্রদান করে- মানব সম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য প্রসার, ব্যক্তিখাতের উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক মুসলিম বিশ্বের নানাবিধ প্রকল্পে আংশিক বা পুরোপুরি অর্থায়ন করেছে। ২৯ জুন ২০১১ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত আইডিবির ৩৬তম বার্ষিক বোর্ড অব গভর্ণর'স সভায় ব্যাংকটির প্রেসিডেন্ট আহমেদ মোহাম্মদ আলী বলেন যে ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠার

---

[১৫৮]. Aims at advancing economic development and social progress for the peoples of the Member States and the Muslim communities in non-member states, individually and collectively, in accordance with the principles of Islamic Sharia. বিস্তারিত: The OIC Journal, May-August 2009, ibid, P. 61.

[১৫৯]. *The Europa World Year Book, ibid, p.368.*

Dhaka University Institutional Repository

পর থেকে ব্যাংকটি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে ৭০ বিলিয়ন ডলার তহবিল প্রদান করেছে।[১৬০] সদস্য দেশগুলোর সরকার অনুমোদিত বিভিন্ন প্রকল্পে আইডিবি অর্থায়ন করে থাকে। তবে শর্ত হচ্ছে যে এসব প্রকল্পকে সদস্য দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনুকূল প্রভাব ফেলতে হবে। ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে আইডিবি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সদস্য দেশগুলোর উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার পাশাপাশি প্রকাশনা ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এছাড়াও বিনিয়োগ, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা ও যোগ্য প্রার্থীদের বৃত্তি প্রদান এবং শিক্ষিত বেকার যুবকদের বিনা মূল্যে এমনকি বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে IDB। সদস্য দেশের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪১২ হি. (১৯৯১/৯২) চালুকৃত মেধাবৃত্তি কর্মসূচির (Merit Scholarship Programme) আওতায় ১৪৩২ হি. পর্যন্ত মোট ৭৬০টি বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংকটি ১৪০৪ হি. (১৯৮৩/৮৪) তে অসদস্য দেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বৃত্তি কর্মসূচি চালু করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় ১৪৩২ সাল পর্যন্ত ৬৭৯৪ জন ছাত্র স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেছে এবং আরো ৪৯৭৭ জন তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।[১৬১]

বিভিন্ন দেশে বসবাসরত মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কল্যাণে IDB এর বিশেষ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক মুসলিম সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, ইসলামি ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি সংরক্ষণ, শিক্ষার উন্নয়ন, সামাজিক ও স্বাস্থ্য সেবা খাতের উন্নয়নে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণে সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও ব্যাংকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সদস্য দেশ বা বহির্বিশ্বের যে কোনো দেশে বসবাসরত মুসলিম জনগোষ্ঠীর দুর্দশা দূরীকরণেও কাজ করে থাকে। এছাড়া ওআইসি আন্তঃবাণিজ্য সম্প্রসারণে ব্যাংকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জানুয়ারি ২০০৮-ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ব্যাংকটি মক্কা বিশেষ সম্মেলনে গৃহীত আন্তঃবাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রা ২০ শতাংশ (২০১৫) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সদস্য দেশগুলোকে ৩৮.৭ বিলিয়ন ডলার অর্থসাহায্য প্রদান করেছে।[১৬২]

---

১৬০. *The OIC Journal,* June-August 2011, Jeddah, Saudi Arab, P. 62.

১৬১. *The Europa World Year Book*, ibid, p.369.

১৬২. *The OIC Journal,* June-August 2011, ibid, P. 63.

Dhaka University Institutional Repository

১৪৩২ হি. (৭ ডিসেম্বর ২০১০-২৫ নভেম্বর ২০১১) আইডিবি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:[১৬৩]

প্রকল্পের ধরণ	প্রকল্পের সংখ্যা	পরিমান (মিলিয়ন ইসলামিক দিনার)
অর্থায়নকৃত প্রকল্প	১৭৪	৩২৫৫.৫
কারিগরি সহায়তা	৯৮	২২.৫
অর্থায়নকৃত ব্যবসা কার্যক্রম	৭৭	২০৫৬.২
বিশেষ সহায়তা কার্যক্রম	৪৯	৯.৬
মোট	৩৯৮	৫৩২১.৩

❖ ইসলামি বাণিজ্য ও শিল্প চেম্বার (ICCI)

ব্যবসা-বাণিজ্য, তথ্যপ্রযুক্তি, বিমা, শিল্প, ব্যাংকিং, বিনিয়োগ সুবিধাদির উন্নয়ন এবং যৌথ উদ্যোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বাড়িয়ে তোলার মানসে ১৯৭৬ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ৭ম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে ইসলামি বাণিজ্য ও শিল্প চেম্বার (Islamic Chamber of Commerce and Industry-ICCI) প্রতিষ্ঠার ধারণা অনুমোদন লাভ করে। তবে ১৯৭৭ সালে ইস্তাম্বুলেই চেম্বারের প্রথম সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটি কার্যক্রম শুরু করে।[১৬৪] ওআইসিভুক্ত ৫৭ টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে এই চেম্বার। এর সদর দফতর পাকিস্তানের করাচিতে। সদস্য দেশগুলোর জাতীয় বাণিজ্য ও শিল্প চেম্বারগুলো এই চেম্বারের সদস্য। ICCI-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে–এর লক্ষ্য হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিমা, জাহাজ শিল্প, ব্যাংকিং, বিনিয়োগ সুবিধাদির উন্নয়ন এবং যৌথ উদ্যোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়িয়ে তোলা।[১৬৫]

২০০৫ সালে তৃতীয় বিশেষ শীর্ষ সম্মেলনে ওআইসির দশসালা পরিকল্পনা অনুমোদিত হওয়ায় চেম্বারের কার্যক্রম আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। এর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে–

- মুসলিম উম্মাহর যেকোনো সমস্যা মোকাবেলায় ইসলামি সংহতি বৃদ্ধিতে ওআইসি এবং এর অঙ্গসংগঠনকে সহযোগিতা প্রদান;

---

১৬৩. *The Europa World Year Book,* ibid, p.370.

১৬৪. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, V-2, p. 305।

১৬৫.(It aims at strengthening closer collaboration in the field of trade, commerce, insurance/reinsurance, shipping, banking, promotion of investment opportunities and joint ventures in the Member countries). বিস্তারিত: *The OIC Journal*, May-August 2009, Jeddah, Saudi Arab, P. 68.

Dhaka University Institutional Repository

- মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদনে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;
- সদস্যভুক্ত দেশসমূহের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিবাদের মধ্যস্থতা করা;
- অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্প্রসারণে সভা, সেমিনারের আয়োজন করা;
- জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ও বিশেষায়িত বাণিজ্য ও শিল্প চেম্বারগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদার করা;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা;
- ইসলামি বিশ্বের মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি ফোরাম তৈরি করা;
- বিনিয়োগে উৎসাহিত করা;
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও কর্মশালার আয়োজন করা।

২০১২ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ইসলামি বাণিজ্য ও শিল্প চেম্বারের ২৮তম সাধারণ সম্মেলনে চেম্বারের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় ইসলামী বাণিজ্য, শিল্প এবং কৃষি চেম্বার (Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture-ICCIA)।[১৬৬]

❖ ইসলামি জাহাজ শিল্প মালিক সংস্থা (OISA)

১৯৮১ সালে মক্কা ও তায়েফে অনুষ্ঠিত তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ইসলামি জাহাজ শিল্প মালিক সংস্থা (Organization of the Islamic Shipowners Association-OISA) গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দুটি কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে সংস্থাটি তার কার্যক্রম শুরু করে-[১৬৭]

১. সদস্য দেশগুলোর নৌ পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন (to work on the development and promotion of maritime transport in the OIC Member States) এবং

২. এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ উপকার অর্জন (to serve the Islamic Ummah in this important and vital field)।

সৌদি আরবের বন্দরনগরী জেদ্দায় সদর দফতরবিশিষ্ট ইসলামি জাহাজ শিল্প মালিক সংস্থা এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল-

- সদস্য দেশগুলোর নৌপরিবহন কোম্পানীগুলোর বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;

---

১৬৬. www.oic.org/affiliated institusions

১৬৭. The OIC Journal, May-August 2009, Jeddah, Saudi Arab, P. 67.

Dhaka University Institutional Repository

- সদস্য দেশগুলোর নৌপরিবহন কোম্পানীগুলোর যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টিকে উৎসাহিত করা;
- মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি সমন্বিত নৌপরিবহন নীতিমালা তৈরির লক্ষ্যে কাজ করা;
- সদস্য দেশগুলোর কারিগরি সহায়তা আদান-প্রদানে সহায়তা করা;
- নৌবহরের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নৌ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- সদস্য দেশগুলোর নৌ নিরাপত্তা, সমুদ্র দূষণ, সমুদ্র আইন এবং নৌ বিমা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে আন্তর্জাতিক আইন ও বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা।[১৬৮]

যেহেতু বিশ্বে বাণিজ্যিক পরিবহনের প্রায় পুরোটাই সমুদ্রপথে হয়ে থাকে-ওজনগত দিক থেকে ধরলে প্রায় ৮৯.৬ শতাংশ পণ্য সমুদ্রপথে পরিবহন করা হয়[১৬৯]-সেহেতু জাহাজের মাধ্যমে মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে যৌথ প্রচেষ্টা স্থাপনের এবং সদস্য দেশগুলোর মাঝে সরাসরি যোগাযোগ ও সংযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠার জন্য আরও প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ওআইসির সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামি জাহাজ মালিক সংস্থাকে আরও সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

❖ বহুপাক্ষিক চুক্তি ও বিধিমালা

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ও একটি বহুপাক্ষিক আইনি পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য ওআইসির সদস্য দেশগুলো বিগত দশকগুলোতে বেশকিছু সংখ্যক বহুপাক্ষিক চুক্তিনামা ও বিধিমালা প্রণয়ন ও গ্রহণ করে। এর মধ্যে কিছু চুক্তি আইনি প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে সফলতার মুখ দেখেছে। তবে কিছু চুক্তিনামা এখনও সদস্য দেশগুলোর আইনি ছাড়ের অপেক্ষায় আছে।

প্রথম চুক্তি–অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সাধারণ চুক্তিনামা (The General Agreement for Economic, Technical and Commercial Cooperation among the OIC Member States) ১৯৭৭ সালে ত্রিপোলিতে অনুষ্ঠিত ৮ম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে গৃহীত হয় এবং ১৯৮১ সাল থেকে চুক্তিটির কার্যকারিতা শুরু

---

১৬৮. Inamullah Khan, ibid, P. 764.

১৬৯. (As of 2006, Seaborne trade accounted for 89.6% of global trade in terms of volume and 70.1% in terms of value.) বিস্তারিত: www.people.hofstra.edu/geotrabs/eng/ch3en/conc3en/ch3c4en.html.accessed ২২ জুন ২০১৫।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। ৪৩টি সদস্য দেশ এতে স্বাক্ষর করেছে এবং ৩১টি সদস্য দেশ এটি অনুসমর্থন দান করেছে।[১৭০] এই চুক্তির লক্ষ্য হল–[১৭১]

- সদস্য দেশগুলোর মাঝে পুঁজি আদান-প্রদান ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা;
- সদস্য দেশগুলোর মাঝে তথ্য, অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিগত ও কারিগরি দক্ষতার আদান-প্রদানের হার বাড়ানো;
- সদস্য দেশগুলোর মাঝে ন্যায্য ও অবৈষম্যমূলক আচরণের প্রসার ঘটানো এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দেয়া।

দ্বিতীয় চুক্তি–সদস্য দেশগুলোর মাঝে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও নিশ্চয়তা প্রদান বিষয়ক চুক্তিনামা (The Agreement for Promotion, Protection and Guarantee of Investments among the OIC Member States), যেটি ১৯৮১ সালে বাগদাদে অনুষ্ঠিত ১২তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে গৃহীত হয় এবং ১৯৮৮ সাল থেকে কার্যকর হয়। ৩১টি সদস্য দেশ এতে স্বাক্ষর করেছে এবং ২৫টি সদস্য দেশ এটি অনুসমর্থন দান করেছে।[১৭২] চুক্তিটি সদস্য দেশগুলোর মাঝে পুঁজিভিত্তিক আদান-প্রদান উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সাধারণ নীতিমালা প্রকাশ করে এবং বিনিয়োগ ঝুঁকি থেকে রক্ষা করার ও পুঁজি স্থানান্তর ও প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা বিষয়ক নীতিমালাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৭৩]

তৃতীয় চুক্তি-প্রথমটি ইসলামি সিভিল এভিয়েশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি চুক্তি (Statute for the Islamic Civil Aviation Council-ICAC), যা ১৯৮২ সালে নিয়ামিতে অনুষ্ঠিত ১৩তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে গৃহীত হয়[১৭৪] এবং ২০০৩ সাল থেকে এর কার্যকারিতা শুরু হয়। তিউনিশে সদর দফতর বিশিষ্ট কাউন্সিলটি ওআইসির একটি অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনুমোদিত। এখন পর্যন্ত মোট ১৭টি সদস্য দেশ চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেছে এবং ১৩টি সদস্য দেশ এটি অনুসমর্থন দান করেছে। চুক্তিটির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের মাঝে রয়েছে–[১৭৫]

> "Reviewing the development of Civil Aviation among the Member States of the OIC, working for the attainment and promotion common regulations in the technical and economic field of air

---

[১৭০]. About OIC Agreement in Economic Field, <http:// www. Oicun.org /uploads/files/convention/oic_AGREEMENT_en_1.pdf.> পৃ. ১

[১৭১]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

[১৭২]. About OIC Agreement in Economic Field, প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

[১৭৩]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

[১৭৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

[১৭৫]. About OIC Agreement in Economic Field, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

transport, and considering any problems that arise in the field of Civil Aviation".

চতুর্থ চুক্তি-ইসলামি দেশগুলোর মাঝে টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (Statute of the Islamic States Telecommunication Union-ISTU) সনদ যা ১৯৮৪ সালে সানাতে অনুষ্ঠিত ১৫তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে গৃহীত হয়।[১৭৬] সদস্য দেশগুলোর মধ্যকার টেলিযোগাযোগ খাতে উন্নতি, নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ সুবিধা, বিশেষজ্ঞ আদান-প্রদান এবং সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে চুক্তিটি করা হলেও আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে এখন পর্যন্ত চুক্তিটি কার্যকারিতা লাভ করেনি। ১৬টি সদস্য দেশ এতে স্বাক্ষর করেছে এবং ১৪টি সদস্য দেশ এটি অনুসমর্থন দান করেছে।[১৭৭] ISTU-এর সনদের ধারা আনুযায়ী এটি ওআইসির একটি বিশেষায়িত সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এর সদর দফতর হবে পাকিস্তানে।

পঞ্চম চুক্তি-ইসলামি দেশগুলোর জন্য মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাপবিদ্যা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের বিধিমালা (Statute for the Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries-SMIIC), যা অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির (COMCEC) তত্ত্বাবধানে তৈরী করা হয় এবং ১৯৮৮ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত এর চতুর্দশ সভায় অনুমোদন লাভ করে।[১৭৮] এখন পর্যন্ত ১৩টি সদস্য দেশ এতে স্বাক্ষর করেছে এবং ৯টি সদস্য দেশ এটি অনুমোদন করেছে।[১৭৯] প্রতিষ্ঠানটির সনদের ধারা অনুযায়ী এটি ওআইসির একটি অধীনস্থ সংগঠন হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এর সদর দফতর হবে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে, যেখানে তার্কিশ মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান (Turkish Standards Institution) প্রতিষ্ঠার প্রথম তিন বছর এর ব্যয়ভার বহন করবে। চুক্তিটির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হল-[১৮০]

> The SMIIC aims at achieving uniformity in metrology, laboratory testing and standardisation activities among member countries and ensuring education and training and providing technical assistance to the OIC members in the domain of standardization and metrology.

ষষ্ঠ চুক্তি-বাণিজ্যিক প্রাধিকারভিত্তিক ব্যবস্থার ঐক্যগত কাঠামো (Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC-

---

১৭৬. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

১৭৭. চুক্তিটি কার্যকর হতে ১৫টি দেশের অনুসমর্থন প্রয়োজন।

১৭৮. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

১৭৯. এটি কার্যকর হতে ১০টি দেশের অনুমোদন প্রয়োজন।

১৮০. About OIC Agreement in Economic Field, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

Dhaka University Institutional Repository

TPS) সংক্রান্ত চুক্তি, যা প্রাথমিকভাবে কমসেক (COMCEC) এর তত্ত্বাবধানে, ইসলামী বাণিজ্য উন্নয়ন কেন্দ্রের (ICDT) মাধ্যমে অক্টোবর ১৯৯০ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে কেন্দ্রের ষষ্ঠ অধিবেশনে চুক্তিটি অনুমোদন লাভ করে। ৩১টি সদস্য দেশ ইতোমধ্যে চুক্তিটিতে স্বাক্ষর প্রদান করেছে এবং ২২টি দেশ সেটিকে অনুসমর্থন দান করেছে।[১৮১] প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুসমর্থন[১৮২] পাওয়ার পর ২০০২ সালে TPS-OIC কার্যকর হয়। ২০০৩ সালে কমসেকের ১৯তম অধিবেশনে এক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের বাণিজ্যিক আলাপ-আলোচনা শুরুর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, যা ২০০৪ সালে তুরস্কে প্রথমবারের মত সক্রিয়ভাবে শুরু করা হয়। প্রথম বৈঠকে TPS-OIC এর ওপর প্রাধিকারভিত্তিক শুল্ক নির্ধারণের বিষয়ে খসড়া চুক্তি প্রস্তুত করার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এই খসড়া চুক্তিটি ২০০৫ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত কমসেকের ২১তম অধিবেশনে অনুমোদন করা হয়। এটি মূলত পরিকল্পনার মাঝে থাকা পণ্যদ্রব্যগুলোর ওপর আরোপিত শুল্ক কমানোর ব্যাপারে কাজ করে থাকে এবং সাথে সাথে শুল্কবহির্ভূত প্রতিবন্ধকতা নিয়ে পর্যালোচনা করে শুল্ক কমাবার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও সময়সীমার নির্ধারণ করা হয়।[১৮৩]

২০০২ সাল থেকে এর কার্যকারিতা শুরু হবার পর একটি বাণিজ্য মধ্যস্থতা কমিটি (Trade Negotiating Committee-TNC) প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মাঝে বাণিজ্যিক মধ্যস্থতার মাধ্যমে বেশ কিছু আইনি দলিলের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য হল- সুবিধাভিত্তিক শুল্ক সংক্রান্ত প্রটোকল বা Protocol on the Preferential Tariff Scheme for TPS-OIC (PRETAS) এবং উৎস সংক্রান্ত বিধিমালা।[১৮৪]

❖ কর্মপরিকল্পনা ১৯৮১ এবং অর্থনীতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটি প্রতিষ্ঠা

১৯৮১ সালে মক্কা ও তায়েফে অনুষ্ঠিত ৩য় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যান্য কিছু দলিলের মাঝে সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার মহাপরিকল্পনাও গৃহীত হয়। এই মহা পরিকল্পনায় ১০টি নির্দিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেগুলো হল- খাদ্য ও কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, যোগাযোগ ও পর্যটন, পরিবহন, আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলী, জ্বালানী ও শক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মানব সম্পদ ও সামাজিক বিষয়াবলী, জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য এবং কারিগরি সহযোগিতা।[১৮৫]

---

[১৮১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

[১৮২]. কার্যকর হতে ১০টি দেশের অনুসমর্থন প্রয়োজন।

[১৮৩]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

[১৮৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

[১৮৫]. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে অর্থনীতি ও বাণিজ্যের সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগগুলোকে সমন্বিত করার জন্য এবং এইসব ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর মাঝে সহযোগিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি (The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation-COMCEC) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে কাসাব্লাঙ্কায় তুরস্কের রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৪র্থ ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে কমসেক কার্যকারিতা লাভ করে।

১৯৮৪ সালের নভেম্বরে কমসেকের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে 'ওআইসির সদস্য দেশগুলোর মাঝে বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন' সংক্রান্ত প্রস্তাবনা পাস করা হয়। পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত বিষয়াবলী পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং ১৯৮৫ সালের সেপ্টেম্বরে এই কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এর বার্ষিক মন্ত্রী পর্যায়ের অধিবেশন এবং পর্যবেক্ষণ কমিটির সভা প্রতি বছর যথাক্রমে শরৎ ও বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৮৭ সালে কুয়েতে অনুষ্ঠিত ওআইসির ৫ম শীর্ষ সম্মেলনে কমসেকের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধনের জন্য কিছু প্রস্তাবনা গ্রহণ করা হয় এবং তুরস্কের দাবীর প্রেক্ষিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কমসেকের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।[১৮৬] ১৯৯৪ সালে ডাকারে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে কমসেকের সনদ ও কার্যপ্রণালী বিষয়ক নিয়ম ও বিধিমালা অনুমোদন করা হয়, যার মাঝে সদস্য সম্প্রসারণের ধারাটিও ছিল।

সদস্য দেশগুলোর মাঝে আন্ত:ওআইসি বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য কমসেক তিনটি বহুপাক্ষিক আর্থিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে-[১৮৭]

- প্রথমটি হল বাণিজ্যে অর্থসাহায্য প্রদানের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, যা এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সিং স্কিম (EFS) নামে অধিক পরিচিত এবং তা ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের অধীনে ১৯৮৭ সাল থেকে কার্যকারিতা লাভ করে। এর লক্ষ্য ছিল অগতানুগতিক দ্রব্য রপ্তানিতে অর্থসাহায্য প্রদান করা।
- দ্বিতীয় উদ্যোগটি ছিল ১৯৯৪ সালে আইডিবি গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ রক্ষা ও পুঁজি রপ্তানী বিষয়ক ইসলামি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবার পর ১৯৯৬ সালে এটি কার্যকরহ য়। এটি সদস্য দেশগুলোর মাঝে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য পুঁজি রপ্তানী ও বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিমা ও পুন:বিমাকরণ প্রক্রিয়া চালু করতে প্রচেষ্টা চালায়।

---

১৮৬. প্রাথমিকভাবে ঠিক করা হয়েছিল যে কমসেকের সদস্য সংখ্যা হবে দশটি। কিন্তু সব সদস্য দেশকে এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে তুরস্ক দাবী তোলায়, সেই দাবীর প্রেক্ষিতে ৫ম শীর্ষ সম্মেলনে এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়।

১৮৭. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

- তৃতীয় পরিকল্পনাটি হল, বহুপাক্ষিক ইসলামি ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের চুক্তি, যা কি না ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে তৈরি করা হয় এবং ১৯৯২ সালে অষ্টম কমসেক সভায় নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়া হয়। এর লক্ষ্য হচ্ছে একটি পদ্ধতি প্রণয়ন করা, যাতে করে ইউনিয়নের সদস্যদের মাঝে বিদ্যমান মুদ্রানীতির প্রক্রিয়া আরও সহজ করা যায়, যেখানে দেশগুলো নিজ নিজ জাতীয় মুদ্রার মাধ্যমে অন্য দেশের সাথে বাণিজ্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে।

১৯৯৪ সালে দশম কমসেকে ওআইসি সদস্য দেশগুলোকে আহবান জানানো হয় তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমঝোতা সম্পন্ন করার জন্য যাতে করে নীতিগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলো পণ্য নির্বাচনে পরস্পরের প্রতি নমনীয় ভাব প্রদর্শন করে এবং এক্ষেত্রে ঐচ্ছিকভাবে সদস্য দেশগুলোর অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়। তবে এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ লাভ করেনি। কমসেকের অন্যতম প্রধান অর্জন হল, বাণিজ্যিক প্রাধিকারভিত্তিক পদ্ধতির কাঠামো প্রণয়ন করা, যা কি না ১৯৯০ সালের ৬ষ্ঠ কমসেক দ্বারা অনুমোদিত হয়।

কমসেকের অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক সহায়তা বিষয়ক নিয়মিত আলোচ্যসূচির পাশাপাশি মন্ত্রী পর্যায়ের বিভিন্ন বার্ষিক সভা নিয়মিতভাবেই অনুষ্ঠিত হতে থাকে যেখানে শিল্পায়ন, খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি উন্নয়ন, যোগাযোগ, পরিবহন ব্যবস্থা, শক্তি, অবকাঠামো এবং জনবল ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে ১৯৮১ সালের কর্মোদ্যোগের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অর্থনৈতিক সহযোগিতার দশটি ক্ষেত্রের বেশিরভাগই একের পর এক উত্থাপিত ও আলোচিত হতে থাকে।

গত শতাব্দীর নব্বই এর দশকে (১৯৮০-১৯৯০) বার্লিন দেয়ালের পতন, জার্মানীর একত্রীকরণ, সমাজতান্ত্রিক ব্লকের পতন, সোভিয়েত ইউনিয়নের অবসান এবং একক ইউরোপীয় বাজারের সৃষ্টির ন্যায় বেশ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার উদ্ভব ঘটে। বিশ্বের এ ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণে ওআইসি সদস্য দেশগুলোর মাঝে উদ্বেগ সৃষ্টি করে কারণ এ ধরনের পরিবর্তন তাদের অর্থনীতি ও পুরো বিশ্বের অর্থনীতির ওপরে কী প্রভাব ফেলতে পারে তা নিয়ে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ে। ফলে তারা ওআইসির অর্থনৈতিক সহযোগিতার বাস্তবিক অবস্থা বিশেষ করে ১৯৮১ সালের কর্মপরিকল্পনার পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নের গুরুত্ব অনুভব করে। এই বিষয়টি কমসেকের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে আলোচিত হয় এবং ১৯৯১ সালে ডাকারে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে কমসেককে কর্মপরিকল্পনার জন্য নতুন কৌশল ঠিক করার অনুরোধ করা হয়।

এই সিদ্ধান্তের সাথে মিল রেখে ইসলামি দেশসমূহের পরিসংখ্যান, অর্থনৈতিক, সামাজিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (SESRIC) একটি প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করে এবং বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সভার পর তা চূড়ান্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে কমসেকের দশম অধিবেশনে নতুন কৌশল ও

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং একই বছরে কাসাব্লাঙ্কায় ৭ম ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে তা অনুমোদিত হয়। এ নতুন কৌশল ওআইসির পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বব্যাপী পরিবর্তন ও নতুন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সার্বিক লক্ষ্য ও মূলনীতি, কার্যসাধন নীতিও নির্ধারণ করে। পাশাপাশি এই পরিকল্পনা প্রতিটি ক্ষেত্রের সমস্যা ও এলাকাভিত্তিক লক্ষ্যও চিহ্নিত করে।[১৮৮]

কমসেকের সর্বশেষ তথা ৩১তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৩-১৪ মে ২০১৫ তুরস্কের আঙ্কারায়। এতে বহুল আলোচিত বিষয়গুলোর মাঝে ছিল-[১৮৯]

- কমসেক পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন;
- দশসালা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন;
- আন্ত:ওআইসি বাণিজ্য বৃদ্ধি;
- অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে সংযুক্তি;
- পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি;
- পর্যটন খাতের উন্নতি;
- খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষি খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং
- আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

❖ দশসালা পরিকল্পনা

সদস্য দেশগুলো যেসব রাজনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে, ওআইসির দশসালা পরিকল্পনা সেগুলো মোকাবেলার বহু উপায় ও পদ্ধতি নির্দেশ করে থাকে। আর্থ-সামাজিক, প্রযুক্তিগত ও বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করা। এক্ষেত্রে বিশেষ করে ওআইসির সদস্য দেশগুলোর প্রচুর অর্থনৈতিক সম্পদ ও ক্ষমতাকে কাজে লাগানোই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এর অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচির মাঝে আছে-[১৯০]

- অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;
- কর্মসূচির নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আন্ত:ওআইসি বাণিজ্য ২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা;
- ওআইসির সদস্য দেশগুলো থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ;
- আফ্রিকার উন্নয়নে সহায়তা করা;

---

১৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।

১৮৯. http:// www.sesrtcic.org/event-detail.php?id=1231 accssed ২৩ জুন ২০১৫।

১৯০. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

- প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সংহতি প্রকাশ করা;
- উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ইস্যুকে প্রাধান্য দেয়া;
- মুসলিম বিশ্বে মহিলা, যুবক, শিশু ও পরিবারের অধিকারকে প্রাধান্য দেয়া;
- সদস্য দেশগুলোর মাঝে সংস্কৃতি ও তথ্যের আদান-প্রদান করা।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এখনও চলমান অবস্থায় আছে। একে ত্বরান্বিত করার জন্য বিশেষ সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। সদস্য দেশগুলো এবং ওআইসির অঙ্গসংগঠন, বিশেষায়িত ও অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে এর বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি ও গতিশীল করার জন্য 'ওআইসির দশসালা পরিকল্পনার বাস্তবায়নের কাঠামো' শীর্ষক একটি দলিলও প্রস্তুত করা হয়েছে। এই কাঠামোগত দলিল সদস্য দেশগুলো, ওআইসির সাধারণ সচিবালয় ও বিভিন্ন ওআইসিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ করণীয় নির্দেশ করে থাকে। ওআইসির সকল প্রধান সভাগুলোতে, শীর্ষ সম্মেলনে, মন্ত্রীপরিষদের সভায় এবং কমসেকসহ স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এর পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা হয়।

সদস্য দেশগুলোর যৌথ উদ্যোগে ও বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে এই পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়ন ও এর লক্ষ্য অনুধাবন করার মাধ্যমে দেশগুলো নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে ও নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সমর্থ হবে এবং উচ্চ পর্যায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভে সক্ষম হবে। কিন্তু এই সকল লক্ষ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে তখনই যখন ওআইসির সদস্য দেশগুলোর সরকারের পক্ষ থেকে দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং চূড়ান্ত সহযোগিতা ও সংহতি পাওয়া যাবে এবং ওআইসির অঙ্গসংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সূক্ষ্ম ও গঠনমূলক সহযোগিতা লাভ করা সম্ভবপর হবে।

463271

❖ আন্ত:ওআইসি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্যিক পদ্ধতি ও প্রচেষ্টার ভূমিকা

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হল, ওআইসির সদস্য দেশগুলোর উৎপাদন ও আয়ের স্বল্পমাত্রা। এই পরিস্থিতি সদস্য দেশগুলোর সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তি যার মাঝে রয়েছে- বিশাল ভূখন্ড, খনিজ সম্পদ, শক্তি (মূলত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস), কৃষি ও জনশক্তি এবং অর্থ সংক্রান্ত উপায় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সাথে একেবারে বিপরীত। বেশিরভাগ ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতে এখনও পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনার যথাযথ ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি; যার ফলে বিশ্ব পর্যায়ে উৎপাদন ও বাণিজ্যভিত্তিক অংশীদারিত্বের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছানোও সম্ভবপর হয়নি। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও তুরস্কের মত কিছু দেশ বাদ দিলে বেশিরভাগ সদস্য দেশগুলোই বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলো এখন পর্যন্ত কিছু সীমিত সংখ্যক প্রাথমিক পর্যায়ের পণ্যদ্রব্য এবং জ্বালানি রপ্তানি করে থাকে। উক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

দেশগুলো সার্বিকভাবে গতানুগতিক, নিম্ন মূল্যমানসম্পন্ন প্রাথমিক পর্যায়ের পণ্যদ্রব্য থেকে উচ্চমানসম্পন্ন কারিগরি পণ্যদ্রব্য রপ্তানির পর্যায়ে উন্নীত হতে এবং তাদের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া ও বিশ্বব্যাপী প্রবল প্রতিযোগিতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি। এর ফলে উন্নত বা সক্ষম দেশগুলোর উৎপাদন উদ্বৃত্ত থাকার কারণে এই দেশগুলো শিল্পোন্নত ও উন্নয়নমুখী দেশগুলোর সেবা ও পণ্যদ্রব্যের–যার মাঝে খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্যও রয়েছে–প্রধান ভোক্তায় পরিণত হয়েছে। এ ব্যর্থতা তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নতির পথে চরম বাধার সৃষ্টি করছে, বিশ্ব বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান সীমাবদ্ধ করছে এবং যার ফলে বিশ্ব বাণিজ্যের উপকারিতা লাভ থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে আন্ত:ওআইসি বাণিজ্যের বিস্তৃতিও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বিশ্বায়নের ফলে পারস্পরিক নির্ভরতার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সঙ্কট খুব সহজে এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অন্য অর্থনৈতিক সমস্যায় ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে ওআইসির বেশ কিছু সদস্য দেশসহ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ভঙ্গুর অর্থনীতি আন্তর্জাতিক বাজারের এরূপ অস্থিরতার জন্য অনেক বেশি মাত্রায় সমস্যার সম্মুখীন হয়। ১৯৯৫ সালে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization-WTO) প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিশ্ব এ ধরনের তিনটি প্রধান সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে–[১৯১]

- ১৯৯৭-৯৮ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও রাশিয়ান সঙ্কট;
- ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত সঙ্কট, যা পুরো ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলকেও তার মাঝে টেনে আনে;
- এবং চলমান যা ২০০৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহায়ন ও ঋণ বাজার থেকে উৎপত্তি এবং ২০০৮ এর মাঝামাঝিতে ইউরোপ এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি জাপানসহ পুরো বিশ্বকে মন্দার দিকে ঠেলে দেয়।

তবে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোতে অবস্থানগত পরিবর্তন করে নেয়া কিছু পদক্ষেপ যেমন–অন্যান্য উন্নয়নশীল অর্থনীতি ও দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানি করা এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করে পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা, এই পদ্ধতিগুলো সদস্য দেশগুলোকে চলমান সঙ্কট মোকাবেলা করতে কিছুটা হলেও সাহায্য করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক সংহতিই হতে পারে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর অর্থনীতিকে সঠিক পথে আনার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হাতিয়ার। যখন মক্কা শীর্ষ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ দশসালা পরিকল্পনার অর্থনৈতিক সহযোগিতার অধ্যায়টির বিধিমালা প্রণয়ন করেছিল তখন তারা আন্ত:ওআইসির বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য কমসেককে নির্দেশ প্রদান করে এবং সদস্য দেশগুলোর মাঝে একটি মুক্ত

---

[১৯১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্যিক এলাকা স্থাপনের সম্ভাবনা নিয়েও কথা বলে। সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহবান জানানো হয় যাতে করে তারা ওআইসির সব বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক চুক্তিগুলোতে স্বাক্ষর এবং অনুমোদন করে। এছাড়াও অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুতকৃত ওআইসির অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা দৃঢ়করণ কর্মসূচির বিধিমালা বাস্তবায়নের জন্যও এ সময় জোর দেয়া হয়। দশসালা পরিকল্পনাটি মূলত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী প্রচেষ্টাসমূহের ওপর নির্ভর করে তৈরি করা হয় এবং আন্ত:ওআইসি বাণিজ্যিক অবস্থা সার্বিকভাবে ২০১৫ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। জুন ২০১১ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত আইডিবির ৩৬তম বার্ষিক সভায় International Islamic Trade Finance Corporation-ITFC এর CEO ওয়ালিদ আল ওহায়িব বলেন যে আন্ত:ওআইসি বাণিজ্য ২০০৪ সালে যেখানে ছিল ১৪ শতাংশ (৩৩৩ বিলিয়ন ডলার) সেখানে ২০১০ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬.৬ শতাংশ (৪৫৬ বিলিয়র ডলার)।[১৯২]

এই লক্ষ্যমাত্রা কমসেকের অন্যান্য অগ্রাধিকারভিত্তিক বিষয়ের সাথে মিলে যায় যেমন–আন্ত:ওআইসিভিত্তিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের বৃদ্ধি। মক্কা শীর্ষ সম্মেলনে নেয়া এক প্রধান সিদ্ধান্তের ফলে সদস্য দেশগুলোর মাঝে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়ে ওঠে আর তা ছিল বাণিজ্যিক অগ্রাধিকার পদ্ধতির কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রণয়ন যা বর্তমানে সদস্য দেশগুলোর মাঝে পুরোমাত্রায় কার্যকর আছে। কমসেকের পৃষ্ঠপোষকতায় এ কাঠামোতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মাঝে ২০০৪ সাল থেকে বাণিজ্যিক মধ্যস্থতাকরণ প্রক্রিয়া চালু হয়েছে।

১৯৮৪ ও ১৯৮৬ সালে সংগঠিত কমসেকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে নেয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইসলামি বাণিজ্যিক উন্নয়ন কেন্দ্র ওআইসির সদস্য দেশগুলোর মাঝে একটি স্থায়ী প্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্যিক পদ্ধতি স্থাপনের জন্য একটি প্রাথমিক চুক্তির কাঠামো তৈরি করে। ১৯৯০ সালে ৬ষ্ঠ কমসেকের অধিবেশনে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর আলোচনা শেষে চুক্তিটির কাঠামো গৃহীত হয় এবং সদস্য দেশগুলোকে তাতে অংশগ্রহণের জন্য আহবান জানানো হয়। TPS-OIC-র ওপর চুক্তিটির কাঠামোটি মূলত সদস্য দেশগুলোর মাঝে একটি প্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার নিয়মাবলীর এক প্রাথমিক আইনি দলিল; চুক্তিটির প্রধান বিষয়গুলোর মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিল–"সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের মর্যাদা" (Most Favoured Nation-MFN) সংক্রান্ত নীতিমালা সদস্য দেশগুলোকে সমসুবিধা প্রদান, স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলোর জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং শুধু ওআইসির সদস্য দেশ দ্বারা গঠিত উপআঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক

---

[১৯২]. *The OIC Journal,* June-August 2011, Jeddah, Saudi Arab, P. 63.

Dhaka University Institutional Repository

জোটের সাথে TPS-OIC-র বাণিজ্যিক মধ্যস্থতাকরণ প্রক্রিয়ার একটি সম্মিলিত উদ্যোগের সম্ভাবনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা।

তৃতীয় বিশেষ শীর্ষ সম্মেলনে এ সকল উদ্দেশ্যগুলোর প্রতি অর্থনৈতিক সহযোগিতার ব্যানারে প্রবল সমর্থন প্রদান করা হয়, বিশেষ করে কমসেককে নির্দেশ প্রদান করা হয়, একটি মুক্ত বাণিজ্যিক এলাকার সম্ভাবনা ও আন্ত:ওআইসির বাণিজ্যিক ক্ষেত্র সম্প্রসারণের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করার জন্য। একটি দশ বছর মেয়াদি সময়সীমা নির্ধারণের ব্যাপারেও নির্দেশনা দেয়া হয় ও আন্ত:ওআইসি বাণিজ্য ২০ শতাংশ (২০০৫ সালের ১৫ শতাংশ থেকে) পর্যন্ত বাড়ানোর ব্যাপারেও প্রস্তাব করা হয়।[১৯৩] এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য সদস্য দেশগুলোর মাঝে মূল বাণিজ্যিক ক্রেতা সংক্রান্ত কাঠামোগত পদ্ধতি পরিবর্তন করলেই হবে না বরং তাদের মাঝে নতুন বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন ও পদ্ধতি উদ্ভাবন শুরু করতে হবে। SESRIC এর হিসাব অনুযায়ী ২০০৭ সালে আন্ত:ওআইসি বাণিজ্য ১৫.২ শতাংশ থেকে ০.৯ শতাংশ বেড়ে ১৬.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।[১৯৪]

❖ উন্নয়নের জন্য ইসলামি সংহতি তহবিল (ISFD)

দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক জটিল সমস্যা যার বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, দুর্ভিক্ষ নিরসন, মহামারী রোগের বিরুদ্ধে উদ্যোগ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন এখনও ওআইসির সদস্য দেশগুলোসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বড় আকারের চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম। বিশ্বের অন্য যে কোনো জায়গার মত ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর মাঝেও দারিদ্র্যের সম্পর্ক হচ্ছে দুর্বল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, দুর্বল মানব সম্পদ, দুর্বল সামাজিক উন্নয়ন এবং দুর্বল অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতিমালার সাথে। UNDP প্রস্তুতকৃত মানব দারিদ্র্যসূচক অনুযায়ী ২০০০ সালে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে তিন-চতুর্থাংশেরই গড়ে মোট জনসংখ্যার ৩০.৪ শতাংশ (৩৪৭.৬ মিলিয়ন) দারিদ্র্যের শিকার। ২০০৫ সাল নাগাদ এই অবস্থার কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন হয়ে ৪১টি ওআইসিভুক্ত দেশের ক্ষেত্রে সূচক মোট জনসংখ্যার ২৯.২ শতাংশে (৩৭২.৯ মিলিয়ন) নেমে আসে।[১৯৫]

SESRIC পরিচালিত "Workshop on Innovative Social Assistance Strategies in Poverty Alleviation" প্রতিবেদনে (২০১১) ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরা হয়। এতে বিশ্বব্যাংকের তথ্যানুযায়ী উল্লেখ করা হয় যে, ওআইসি

---

১৯৩. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২।

১৯৪. SESRIC, ওআইসি সদস্য দেশসমূহ: অর্থনৈতিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ২০০০-২০০৭, আঙ্কারা, নভেম্বর ২০০৮।

১৯৫. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার ১৮টি দেশ নিম্ন আয়ভুক্ত, ৩২টি দেশ মধ্যম আয়ভুক্ত (১৮টি দেশ নিম্ন মধ্যম আয়ভুক্ত এবং ১৪টি দেশ উচ্চ মধ্যম আয়ভুক্ত) এবং ৭টি দেশ উচ্চ আয়ভুক্ত। এছাড়া UNDP-এর বরাতে উল্লেখ করা হয় যে, ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার ২৫টি দেশ নিম্ন মানব উন্নয়ন ক্যাটাগরির, ১৬টি দেশ মধ্যম মানব উন্নয়ন ক্যাটাগরির এবং বাকী ১৬টি দেশ উচ্চ মানব উন্নয়ন ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত।[১৯৬]

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই ওআইসির আলোচ্যসূচিগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এর অঙ্গসংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি সদস্য দেশগুলোর ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সবচেয়ে নতুন ও শক্তিশালী অঙ্গীকারনামা প্রদান করা হয় ২০০৫ সালে মক্কা শীর্ষ সম্মেলনে। এ সভায় বিষয়টিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে ধরা হয় এবং আইডিবির পৃষ্ঠপোষকতায় দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য একটি বিশেষ তহবিল প্রতিষ্ঠারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যেন তারা এই তহবিলের অর্থ সংগ্রহ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল গ্রহণ করে।[১৯৭]

> (Establish a special fund within the IDB in order to help address and alleviate poverty and commission the IDB board of Governors to establish this special fund, including mechanisms for its financing).

আইডিবি পুরো বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ তহবিলের খসড়া নীতি প্রণয়ন সম্পন্ন করে। ২০০৭ সালে ডাকারে অনুষ্ঠিত আইডিবির ৩২তম পরিচালনা পরিষদের সভায় উন্নয়নের জন্য ইসলামি সংহতি তহবিল[১৯৮] (Islami Solidarity Fund for Development- ISFD) প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে অনুমোদন দেয়া হয় এবং তার সাথে সাথে এর ব্যবস্থাপনার জন্য ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।[১৯৯] বিধিমালা অনুযায়ী এই ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ওয়াকফ হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং এই বিনিয়োগ থেকে লাভকৃত আয় সদস্য দেশগুলোর দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচিতে ব্যবহার করা হবে। তহবিলটি সদস্য দেশগুলোর স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত অনুদানের মাধ্যমে গঠন করা হয় এবং ২০০৮

১৯৬.(Workshop on Innovative Social Assistance Strategies in Poverty Alleviation 12-14 December 2011 Ankara,Turkey).বিস্তারিত:<http://www.sesrtcic.org/imgs/news/image/620-statement-session2-5.pdf> পৃ. ৭।

১৯৭. OIC Ten-Year Programme of Action, <www.oic-oci.org>

১৯৮. আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৭৬ সাল থেকে "ইসলামী সংহতি তহবিল"(ISF) নামে আরোকটি তহবিল ওআইসির অঙ্গসংগঠন হিসেবে কাজ করে আসছে যা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, শিক্ষা বিষয়ক, প্রাতিষ্ঠানিক, কারিগরি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

১৯৯.(Workshop on Innovative Social Assistance Strategies in Poverty Alleviation 12-14 December 2011 Ankara,Turkey). প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

সালের জানুয়ারিতে তা আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। ২০০৮ সালের শেষে ৩৩টি সদস্য দেশ তাদের অনুদান ঘোষণা করে যার মোট পরিমাণ প্রায় ১.৬১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অনুদান এসেছে সৌদি আরব (১ বিলিয়ন ডলার), কুয়েত (৩০০ মিলিয়ন ডলার), ইরান (১০০ মিলিয়ন ডলার), কাতার (৬০ মিলিয়ন ডলার) এবং আলজেরিয়া (৫০ মিলিয়ন ডলার)। কিছু স্বল্পোন্নত আফ্রিকান সদস্য দেশও অনুদান প্রদান করে, যার মাঝে সুদান (১৫ মিলিয়ন ডলার) এবং সেনেগাল (১০ মিলিয়ন ডলার) অগ্রগামী অবস্থানে রয়েছে। আইডিবিও দশ বছর মেয়াদকালীন সময়ের মাঝে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থসাহায্য দেয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দেয়। তহবিলটি স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলোর বিশেষ করে আফ্রিকান উপসাহারা অঞ্চলের জন্য দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদানে গঠন করা হয়।[২০০]

ISFD-এর পরিচালনা পর্ষদ ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তেহরানে মিলিত হওয়ার পর তহবিলটির পাঁচ বছর মেয়াদি কর্মকৌশলের দলিলটির অনুমোদন দেয়, যা বেশ কিছু কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্য স্থির করেছিল। প্রথম পাঁচ বছরে কর্মকৌশলে দুটো কর্মসূচিকে প্রাধান্য দেয়া হয়-[২০১]

- কারিগরি শিক্ষা কর্মসূচি (Vocational Literacy Program-VOLIP) এবং
- ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা কর্মসূচি (Microfinance Support Program-MFSP).

এইসব কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য পূর্ণ করা এবং সদস্য দেশগুলোতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি অর্থসাহায্যের অপ্রতুলতা দূর করা। প্রতিটি কর্মসূচির পেছনে ব্যয় ধরা হয় প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ধারণা করা হচ্ছে যে, পাঁচ মিলিয়ন মানুষ, যার মধ্যে বেশিরভাগই হল মহিলা এবং বেকার এসব উদ্যোগ থেকে লাভবান হবে। ২০০৭ এর মে মাসে যাত্রা শুরু করার পর থেকে তহবিলটির পরিচালনা পর্ষদ মোট ২৮টি দেশে ৫৬টি প্রকল্প শুরু করে যার মোট ISFD প্রদানকৃত অনুদান হল ৫৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[২০২] বর্তমানে এটি মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক প্রকল্প সমূহের উপর গুরুত্বারোপ করেছে।

---

২০০. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২০৭।

২০১. http://www.sesrtcic.org/imgs/news/image/620-statement-session2-5.pdf পৃ. ১৭।

২০২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

❖ তুলা প্রকল্প

তুলা উৎপাদন হল বেশিরভাগ পশ্চিম আফ্রিকান ও কেন্দ্রীয় আফ্রিকান (Western and Central African-WCA) দেশগুলোর[২০৩] প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। তুলা উৎপাদন WCA ভুক্ত দেশগুলোর মোট দেশীয় উৎপাদনের (জিডিপি) ৫-১০ শতাংশ বহন করে এবং তাদের পুরো রপ্তানী আয়ের ৩০ শতাংশ পূরণ করা হয় তুলা রপ্তানীর মাধ্যমে।[২০৪] তুলা চাষাবাদ ঐ সকল অঞ্চলের বেশীরভাগ গ্রামীণ জনগণের আয়ের উৎসও বটে। যদিও এসব দেশগুলোর তুলা উৎপাদন ও রপ্তানী যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছে, আন্তর্জাতিক তুলা পরামর্শক কমিটির[২০৫] (International Cotton Advisory Committee-ICAC) পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মূলত মুদ্রাস্ফীতির কারণে তুলার মূল্য দীর্ঘদিন ধরেই ক্রমশ কমে যাচ্ছে।[২০৬] তার পাশাপাশি ২০০৮ সালের ৩ নভেম্বর ICAC কর্তৃক ইস্যুকৃত সংবাদ বার্তায় বলা হয় যে, তুলার মূল্য ২০০৮ সালের অক্টোবরের সময় থেকেই ক্রমশ নিম্নমুখী হয়ে আছে। তুলার মূল্য এভাবে কমে যাওয়া, তুলা রপ্তানীনির্ভর দেশগুলোর বিশেষ করে আফ্রিকান দেশগুলোর উন্নয়ন ও স্থায়ী প্রবৃদ্ধির জন্য বড় হুমকিস্বরূপ। এ অবস্থার পেছনে মূল কারণ হল, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর নিজ দেশীয় কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেয়ার ফলে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রভাব। এই ভর্তুকি মূলত তাদের দেশীয় তুলা উৎপাদনকারীদের সহায়তা করার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে করে উচ্চ উৎপাদনশীলতা ও রপ্তানী খাত সৃষ্টি করা যায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তুলার মূল্য কমিয়ে আনা যায়। এর ফলে তুলা উৎপাদনকারী দরিদ্র দেশগুলোর রপ্তানী আয় বেশ ভয়াবহভাবে কমে যাচ্ছে এবং অর্থনীতিতে বড় আকারের সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে।

কোন রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রপুঞ্জের বাণিজ্যে ক্ষতিসাধনকারী নীতি সুস্পষ্টভাবে WTO-এর মূলনীতির এবং মুক্ত বাণিজ্যের নীতিমালার বিরোধী। উন্নয়নশীল দেশগুলো WTO এর সভায় উন্নত দেশগুলো কর্তৃক গৃহীত এরূপ অসম কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ২০০১ সালে দোহায় অনুষ্ঠিত WTO এর মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে একটি বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক আলোচনার সূচনা করা হয় যেখানে এসব বিষয়াদি ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে দোহা উন্নয়ন বৈঠক ও ২০০৩ সালে মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত ৫ম

---

২০৩. WCA ভুক্ত দেশগুলো হচ্ছে বেনিন, বুরকিনা ফাসো, ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, চাদ, আইভরিকোস্ট, মালি, সেনেগাল ও টোগো।

২০৪. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

২০৫. ICAC হল তুলা উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী দেশসমূহের একটি সরকারি সংগঠন।

২০৬. (The price of cotton, adjusted for inflation, is tending downward over the long run), <http://www.icac.org/cotton_info/speeches/townsend/2007/wto_june_2007.pdf> accessed ২২ জুন ২০১৫।

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রী পর্যায়ের WTO এর সম্মেলন নিয়ে যে উচ্চাশা ছিল তা পুরোপুরি ধূলিসাৎ হয়ে যায় মূলত উন্নত দেশগুলোর অনমনীয় অবস্থানের কারণে। বিশেষ করে ইইউ'র (European Union) অবস্থানের কারণে কানকুনে আলাপ আলোচনার সমাপ্তি ঘটে কৃষি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বিষয়ে কোন প্রকার চুক্তি ছাড়াই।[২০৭] কানকুনের সভা কৃষি ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক অসমতা কমাবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারত। কৃষি ক্ষেত্রে ভর্তুকি কমাবার মাধ্যমে যেসব মানুষ দারিদ্র্যের মাঝে বসবাস করছে তাদের অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব হত, উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যেত, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যেত এবং গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান বাড়ানো যেত।

এই আলাপ-আলোচনাকালীন সময়ে চারটি তুলা উৎপাদনকারী ওআইসিভুক্ত আফ্রিকান দেশ- বেনিন, বুরকিনা ফাসো, চাদ ও মালি নেতৃত্ব প্রদান করে ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বাণিজ্যে ক্ষতিসাধনকারী ও তুলা রপ্তানী খাতে নিম্নমুখী ধারা সৃষ্টিকারী সব প্রচেষ্টা দূরীকরণের জন্য দাবি উত্থাপন করে। এই দাবিটি 'তুলা বিষয়ক উদ্যোগ' (Cotton Initiative) হিসেবে পরিচিত।[২০৮] প্রস্তাবে আরো উল্লেখ করা হয় যে, উন্নত দেশগুলোর এ ধরণের কর্মকান্ডের ফলে আফ্রিকার দেশগুলো ব্যাপক ক্ষতির শিকার হচ্ছে। কানকুন সম্মেলনের ব্যর্থতার ফলে পশ্চিম-আফ্রিকার ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর তুলা খাতে উন্নয়নের জন্য আন্ত:ওআইসি সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, তুলা উৎপাদনকারী দেশগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারভিত্তিক ইস্যুতে পরিণত হয়। ইতোমধ্যে তুলার ক্রমশ নিম্নমুখী মূল্যগত অবস্থান, যা মাঝে মাঝে উৎপাদন খরচেরও নিচে চলে যায়, তা তুলা উৎপাদনকারী দেশের বিশেষ করে উপসাহারার আফ্রিকান অঞ্চলের ছোট খামার ও কৃষকদের ধ্বংস করে দিয়েছে। অবশ্য তুলার উৎপাদন আরও কিছু প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়, যার মাঝে আছে-কৃষিজ যন্ত্রপাতি ও উদ্যোগের অভাব গ্রামীণ অবকাঠামোর ক্ষেত্রে অপ্রতুলতা, কৃষিজ পুঁজির অপর্যাপ্ততা, দূর্বল বাজার ব্যবস্থা, পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতির কারণে কৃষিজ উৎপাদনের নিচু হার, চাষযোগ্য জমির অভাব, সেচের ক্ষেত্রে সমস্যা, স্থানীয় বীজের অভাব এবং সস্তা কৃত্রিম সুতা ও শিল্পজাত পণ্যেও রাণিজ্য ও চায়না থেকে আমদানিকৃত তৈরী পোশাকের সহজলভ্যতা।

এসব বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০০৫ সালের ১৮-১৯ এপ্রিল ওআইসির সাধারণ সচিবালয়, বুরকিনা ফাসোর সরকার, আইডিবি ও ইসলামি বাণিজ্য কেন্দ্রের সহায়তায় উগাডুতে একটি সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে তুলা উৎপাদনকারী ওআইসির সদস্য দেশগুলোতে বাণিজ্যের সমৃদ্ধি সাধন ও বিনিয়োগের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকান তুলার

---

২০৭. বিস্তারিত: Agriculture negotiations <http:// www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min03_e/draft_decl_rev2_e.htm>

২০৮. বিস্তারিত : The Cotton Initiative <http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd20_cotton_e.htm>

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যবৃদ্ধির লক্ষ্যে এর উন্নয়ন ঘটানো এবং তুলার শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ আর্থিক ও কৌশলগত সহায়তা প্রদান।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বেশ কিছু সদস্য দেশ এ ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করে ও আফ্রিকান ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর সাথে সংহতি বাড়ানোর জন্য এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। এদের মাঝে রয়েছে- ইরান, কুয়েত, মালয়েশিয়া, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। বিশেষ করে তুরস্ক একটি অভিজ্ঞ তুলা উৎপাদনকারী ও প্রস্তুতকারী দেশ হিসেবে এই ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য একটি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সভার আয়োজন করে। আইডিবির সহায়তার মাধ্যমে তুলা উৎপাদনকারী দেশগুলোর মাঝে একটি সহযোগিতামূলক কৌশল গ্রহণ করার ব্যাপারে তুরস্ক ২০০৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হল তুলা উৎপাদনকারী সদস্য দেশগুলোর মাঝে বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় করা, বিনিয়োগ বাড়ানো ও প্রযুক্তি আদান-প্রদান করা, যা কি না আফ্রিকান দেশগুলোকে উন্নয়নে প্রভূত সাহায্য করবে। এই পরিকল্পনাতে অগ্রাধিকার দেয়া হয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদনগত কৌশলের প্রবৃদ্ধি করা, সদস্য দেশগুলোর অবকাঠামোগত ক্ষমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, বাণিজ্যগত ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি করা এবং এইসব কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা করার ওপর।[২০৯] এ লক্ষ্যে ১৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ-বরাদ্দ করা হয়।[২১০] এই পরিকল্পনা ২০০৬ সালে ইস্তাম্বুলে কমসেকের ২২তম অধিবেশনে গ্রহণ করা হয়।

তুলা উৎপাদন সংক্রান্ত ৫ বছর মেয়াদী এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তুরস্ক ২০০৭ সালের ১২-১৩ নভেম্বর ইস্তাম্বুলে ওআইসি সদস্য দেশগুলোকে নিয়ে তুলার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য একটি সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় আফ্রিকান, এশিয়ান ও আরব দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তুলা উৎপাদন ও শিল্পায়ন সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর প্রখ্যাত কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা হয়। যেগুলো হচ্ছে আফ্রিকার নাইজেরিয়া ও সেনেগাল, এশিয়ার পাকিস্তান ও তুরস্ক এবং আরব

---

[২০৯]. Action Plan aimed to: Enhance productivity and production techniques; Strengthen structural capacities and organizations; Develope the field of processing and marketing; Trade and international competitiveness; and Arrange finances for the activities.(Workshop on Innovative Social Assistance Strategies in Poverty Alleviation 12-14 December 2011 Ankara, Turkey).

বিস্তারিত: <http:// www.sesrtcic.org/imgs/news/image/620-statement-session2-5.pdf> পৃ. ১৯।

[২১০]. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দেশগুলোর মিসর ও সিরিয়া। এ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন চূড়ান্ত করার জন্য একটি পরিচালনা কমিটির তত্ত্বাবধানে একটি প্রকল্প কমিটিও গঠন করা হয় যার কাজ হল তুলার শিল্পায়ন ও সেই সম্পর্কিত কার্যাবলীর সাথে জড়িত সদস্য দেশগুলো, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ওআইসির অঙ্গ সংগঠন ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ করা। ২০০৭ সালের নভেম্বরে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত কমসেকের ২৩তম অধিবেশনে ফোরামটির ফলাফল গ্রহণ করা হয়। আশা করা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপনের মধ্য দিয়ে তুলা উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী দেশগুলোর মাঝে সহযোগিতার সুফল ভোগ করতে শুরু করবে।[২১১]

❖ আফ্রিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি (SPDA)

২০০৫ সালের শেষ দিকে মক্কা শীর্ষ সম্মেলনে ওআইসির দশশালা পরিকল্পনার ভূমিকায় আফ্রিকার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদানের জন্য দাবি তোলা হয়। ওআইসি দেশগুলোর মধ্যে এ অঞ্চলই সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্য, রোগ, নিরক্ষরতা, দুর্ভিক্ষ এবং ঋনের দায়ে জর্জরিত হয়ে ভয়াবহ এক পরিস্থিতির মাঝে রয়েছে। এ পরিকল্পনায় আফ্রিকার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় সম্বলিত একটি বিশেষ অধ্যায়[২১২] সংযোজন করা হয় যার মাঝে শিল্পায়নে সাহায্য প্রদান, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে আদান-প্রদানমূলক ব্যবস্থা, তাদের ঋণগ্রস্ত অবস্থা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং রোগজীবাণুর মূলোৎপাটন করা-এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২১৩] এছাড়া আফ্রিকার উন্নয়নের জন্য ওআইসি "আফ্রিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি"র (Special Program for the Development of Africa-SPDA) আওতায় ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা কার্যক্রম চালু করে। SPDA-এর আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল-

- কৃষি এবং খাদ্য নিরাপত্তা;
- পানি এবং পয়:নিস্কাশন;
- পরিবহন অবকাঠামো;

---

[২১১]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০।

[২১২]. অধ্যায়- IV.Supporting Development and Poverty Alleviation in Africa.

[২১৩]. যেমন- 1. Promote activities aimed at achieving economic and social development in African countries, including supporting industrialization, emerging trade and investment, transferring technology, alleviating their debt burden and poverty, and eradicating diseases; welcome the New Economic Partnership for African Development (NEPAD), adopt to this end, a special program for the development of Africa.

2. Call upon the Member States to participate in international efforts to support programmes aimed at alleviating poverty and capacity-building in the Least-Developed Member States of the OIC.

Dhaka University Institutional Repository

- শিক্ষা ব্যবস্থা এবং
- রোগজীবাণুর মূলোৎপাটন।

২০১১ সাল পর্যন্ত আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলের ২২টি সদস্য দেশে ২৯৬টি প্রকল্পের মাঝে ৩.০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদন করা হয়েছে।[২১৪] এ কর্মসূচির ধারা গুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে আফ্রিকাসহ মুসলিম দেশগুলো বিশেষ করে স্বল্পোন্নত অঞ্চলের কৃষকদের আয় বাড়বে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। তাছাড়া এর মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে দারিদ্র্য দূরীকরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ওআইসি দশসালা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ওআইসির অঙ্গসংগঠন SESRIC উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে জুলাই ২০০৭ সালে "Cassava Integrated Project for Food Security & Poverty Alleviation in the OIC Member States of sub-Saharan Africa" নামে একটি বৃহৎ প্রকল্প প্রস্তাবনা পেশ করে।[২১৫]

❖ যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প: ডাকার পোর্ট সুদান রেল সংযোগ

ওআইসির বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সব প্রতিবন্ধকতা অন্যতম তা হল-সড়ক যোগাযোগ এবং টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উন্নয়নের অভাব, সদস্য দেশগুলোর মাঝে সরাসরি বাণিজ্যিক সংযোগ পথের অভাব, অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা ইত্যাদি, যেগুলো কি না আন্ত:ওআইসি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কেও পথে বাধার সৃষ্টি করছে এবং আন্ত:শিল্প কারখানাভিত্তিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরণের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিনিয়োগ চাহিদা ও যোগান উভয় ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধন করে। এর ফলে উৎপাদন খরচ কমে যায়, বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক পক্ষ ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের মাঝে সংযোগ স্থাপন করা সহজ হয়। বিশেষ করে সড়ক যোগাযোগ, মাল পরিবহন ও টেলিযোগাযোগের ব্যবস্থার উন্নয়ন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পর্যায়ের ও প্রস্তুতকৃত পণ্যদ্রব্য ভোক্তাদের কাছে সরবরাহ করাসহ সেবা ও অপরিমাপযোগ্য দ্রব্যাদির এ ব্যবস্থার মাধ্যমে আদান-প্রদান করা হয়। বলাবাহুল্য যে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা ও ঝামেলামুক্ত টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বিভিন্ন অঞ্চল, রাষ্ট্র ও ব্লকের টেকসই ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

[২১৪].(Workshop on Innovative Social Assistance Strategies in Poverty Alleviation 12-14 December 2011Ankara,Turkey). প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

[২১৫]. <http://www.sesrtcic.org/files/article/386.pdf.>

Dhaka University Institutional Repository

ওআইসির দেশগুলোর ভৌগোলিক বৈচিত্র্য প্রাকৃতিক বাধা হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। যার ফলে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও একক বাজার ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে পরিবহন ব্যবস্থা ও টেলিযোগাযোগ খাতকে আরও উন্নত করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পরে। এসব সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতা ব্যবসায়ী ও অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের পণ্যের মূল্য বাড়াতে বাধ্য করে, যা কি না বর্তমান বিশ্বের তীব্র প্রতিযোগিতাময় বাজারে তাদের জন্য এক অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সুতরাং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সদস্য দেশগুলোর জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিশেষ করে যখন বেশিরভাগ সদস্য দেশই মূলত প্রাথমিক পণ্যদ্রব্য সামগ্রির যোগানদাতা। এ প্রেক্ষিতে আফ্রিকার ভূমিবেষ্টিত দেশগুলোর ক্ষেত্রে নিকটবর্তী সমুদ্রবন্দর থেকে পণ্য পরিবহনের অতিরিক্ত খরচের বিষয়টি একটি বিশেষ উদ্বেগের কারণ।

২০০৮ সালে মার্চ মাসে ডাকারে অনুষ্ঠিত ১১তম ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে সুদানের সরকার কর্তৃক ডাকার-সুদান রেল সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। এ লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যেখানে সদস্য হিসেবে ওআইসির সাধারণ সচিবালয়, আইডিবি ও দশটি আফ্রিকান দেশের (বুরকিনা ফাসো, ক্যামেরুন, চাদ, জিবুতি, গাম্বিয়া, গিনি, মালি, নাইজেরিয়া, নাইজার, সেনেগাল, সুদান এবং উগান্ডা) নাম প্রস্তাব করা হয়। এই কমিটির কাজ হবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান ও আয়ের উৎস সৃষ্টি হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২০০৮ সালের জুলাই মাসে উক্ত কমিটির একটি সভা জেদ্দাতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তমালা অনুযায়ী ওআইসির সাধারণ সচিবালয়, প্রকল্পটির কার্যকরী কমিটির সাথে (সুদান, নাইজার, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, সচিবালয় ও আইডিবি) সম্মিলিতভাবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী একটি খসড়া প্রকল্প প্রস্তুত করে এবং সকল সংশ্লিষ্ট দেশ ও প্রতিষ্ঠানের কাছে তা পৌছে দেয়। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তা যৌথ উদ্যোগের স্মরণীয় এক উদাহরণ হবে এবং সদস্য দেশগুলোর যৌথ উদ্যোগের প্রতি দৃঢ় অঙ্গিকার ও সাফল্যের এক অনন্য নিদর্শন হবে।[২১৬]

❖ ইসলামি বাণিজ্যমেলার আয়োজন

সর্বপ্রথম তুরস্ক ইসলামি বাণিজ্যমেলা আয়োজনের পরিকল্পনা উপস্থাপন করে। ১৯৭৯ সালের মে মাসে ফেজে অনুষ্ঠিত ১০ম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে তুরস্ক নভেম্বর ১৯৭৯-তে ইসলামি বাণিজ্যমেলা আয়োজনের প্রস্তাব এবং বাণিজ্য বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করার প্রস্তাব দুটি গৃহীত হয়। এরপর তুরস্কের রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে কমসেক (COMCEC) যাত্রা

---

[২১৬]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১।

Dhaka University Institutional Repository

শুরু করলে ইসলামি বাণিজ্যমেলা নিয়মিতভাবে আয়োজনের দায়িত্ব দেয়া হয় ইসলামি বাণিজ্য উন্নয়ন কেন্দ্রের (ICDT) ওপর। এরপর থেকে দ্বিবার্ষিকভাবে ইসলামি বাণিজ্যমেলা ICDT ও আমন্ত্রক দেশের সহযোগিতার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এখন পর্যন্ত বারটি ইসলামি বাণিজ্যমেলা সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে সদস্য দেশগুলোর বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা ও সত্ত্বা অংশগ্রহণ করেছে।[২১৭]

ইসলামি বাণিজ্যমেলা

	স্থান	তারিখ
প্রথম	ইস্তাম্বুল	১৮-৩০ নভেম্বর ১৯৭৯
দ্বিতীয়	কাসাব্লাঙ্কা	৫-১৪ এপ্রিল ১৯৮৬
তৃতীয়	কায়রো	১১-১৯ অক্টোবর ১৯৮৮
চতুর্থ	তিউনিশ	৫-১৪ অক্টোবর ১৯৯০
পঞ্চম	তেহরান	১৬-২১ জুলাই ১৯৯৪
ষষ্ঠ	জাকার্তা	২২-২৭ অক্টোবর ১৯৯৬
সপ্তম	ত্রিপোলি, লেবানন	১২-১৮ অক্টোবর ১৯৯৮
অষ্টম	দোহা	১৫-২০ অক্টোবর ২০০০
নবম	সারজাহ	২১-২৬ ডিসেম্বর ২০০২
দশম	মানামা	৫-৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
একাদশ	ডাকার	২১-২৫ নভেম্বর ২০০৭
দ্বাদশ	কায়রো	১১-১৬ অক্টোবর ২০০৯

❖ পর্যটন উন্নয়ন সহযোগিতা

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ওআইসি সদস্য দেশগুলোর মাঝে পর্যটনশিল্প উন্নয়নের পরিকল্পনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮১ সালে সদস্য দেশগুলোর মাঝে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য যে কর্মপরিকল্পনা নেয়া হয় তাতে পরিবহন, যোগাযোগ ও পর্যটনের ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর কার্যাবলীর সমন্বয় কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৪ সালের কর্মপরিকল্পনাতেও পর্যটন বিষয়ে একটি পুরো অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে পর্যটন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সদস্য দেশগুলোর মাঝে বেশ আগ্রহের সৃষ্টি করেছে এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতার অন্যতম ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অনেক দেশে এটি সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। একই সাথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসৃষ্টিকারী খাত হিসেবে বিবেচিত।

---

২১৭. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪-২০৫।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও পর্যটনশিল্প নতুন অবকাঠামোগত উন্নয়নে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণের জন্যও অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহিত করে থাকে। পর্যটনকেন্দ্রিক চাকরি ও ব্যবসা একটি দেশের সবচেয়ে অনুন্নত অংশে সৃষ্ট হয়ে থাকে, যা পুরো দেশ জুড়ে অর্থনৈতিক সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা আনতে সহায়তা করে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে পর্যটনশিল্প জনগণের আয় বাড়ানোর জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

ক্রমঅগ্রসরমান এই শিল্পের গুরুত্বকে অনুধাবন করে ওআইসির সদস্য দেশগুলো সাম্প্রতিক সময়ে পর্যটনশিল্পের বিকাশে বেশি মনোযোগ দিয়েছে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা কামনা করেছে। ২০০০ সালে ইরানের ইস্ফাহানে প্রথম পর্যটনমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ওআইসির পর্যটনমন্ত্রীরা আরও ছয়বার মিলিত হয়েছে। যার মধ্যে শেষবার (ষষ্ঠ পর্যটনমন্ত্রীদের সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালের জুলাইতে সিরিয়ার দামেস্কে। এতে একটি দলিল গৃহীত হয়, যার শিরোনাম ছিল 'ওআইসির সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মাঝে পর্যটন খাতে সহযোগিতা ও উন্নয়নের অবকাঠামো'।[২১৮] পরবর্তীতে ২০০৭ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত পর্যটনশিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ দলের সভাতে এর শিরোনাম বদলে 'ওআইসির সদস্য দেশগুলোর মাঝে পর্যটনশিল্পের উন্নয়নের জন্য কৌশলগত পরিকল্পনা' করা হয়। এই দলিলে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল-

- সদস্য দেশগুলোর মাঝে অসদস্য দেশগুলো থেকে পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি;
- সদস্য দেশগুলোর মাঝে পর্যটনভিত্তিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার উপায় বের করা;
- ওআইসির সদস্য দেশগুলোর মাঝে বিনিয়োগের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন ও স্থাপনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং
- পর্যটন খাতের জন্য আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করা।

এক্ষেত্রে আঞ্চলিক কর্মোদ্যোগের একটি ভালো উদাহরণ হল 'পশ্চিম আফ্রিকায় আন্ত:সীমান্ত পার্ক ও অঞ্চল সংরক্ষণের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন' শীর্ষক একটি প্রকল্প, যা ওআইসির সদস্য দেশগুলো থেকে পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করে। ওআইসিভুক্ত নয়টি পশ্চিম আফ্রিকান দেশ- বেনিন, গাম্বিয়া, গিনি, গিনি-বিসাউ, মালি, মৌরিতানিয়া, নাইজার, সেনেগাল ও সিয়েরা লিওন এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। এর লক্ষ্য হল-

- এই অঞ্চলে পর্যটনশিল্পের স্থায়ী উন্নয়ন সম্পাদন;
- এ সকল দেশগুলো থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং
- পরিবেশ সংরক্ষণ।

বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (World Tourism Organization-WTO), এসটিইপি (Sustainable Technology Environment Program-STEP) ফাউন্ডেশন এবং

---

[২১৮]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩।

Dhaka University Institutional Repository

কোরিয়ান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা এই প্রকল্পের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এবং এই প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য অর্থসাহায্য দেয়ার ব্যাপারেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যার মোট অর্থমূল্য হল ৪ লক্ষ ২৫ হাজার মার্কিন ডলার।[২১৯] পর্যটন মেলা হল বিভিন্ন পর্যটনভিত্তিক পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা তুলে ধরার ও বিপণনের জন্য অন্যতম প্রধান মাধ্যম। ২০০১ সালে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পর্যটনমন্ত্রীদের সম্মেলনে ICDT কে অনুরোধ করা হয়, ওআইসি সদস্য দেশগুলোর জন্য একটি পর্যটনমেলা আয়োজন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। ২০০২ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত অষ্টম COMSEC এর অধিবেশনেও একই লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রথম পর্যটনমেলা ২০০৫ সালে ২৪-২৬ নভেম্বর ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত হয় যা কি না যৌথভাবে আয়োজন করে ICDT ও তুরস্ক পর্যটন সহায়তা বিষয়ক এজেন্সি (Association of Turkish Travel Agencies-TURSAB) এবং ইস্তাম্বুলের প্রদর্শনী কেন্দ্র (International Conference Organisers-CNR)।[২২০]

ওআইসিভুক্ত দেশসমূহে পর্যটকদের আগমন ও এ সংক্রান্ত আয়:[২২১]

	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১
ওআইসিভুক্ত দেশসমূহে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আগমন (হাজার)	১৩১৬৪৭	১৪৩১০৯	১৪৩৫৬৬	১৫৪৭০৬	১৫১৫৯৮
ওআইসিভুক্ত দেশসমূহে পর্যটন আয় (মিলিয়ন ডলার)	১০৬৯৩৭	১২২৯২৭	১১৯৭১৪	১৩৩২৮৪	১৩৫৪৭১
আন্ত:ওআইসি পর্যটকদের আগমন (হাজারে)	৪৭১০০	৪৯২৭৯	৪৮৮৯৪	৫৩৩৪৬	৫৪৩৭৮
আন্ত:ওআইসি পর্যটকদের আগমন সংক্রান্ত আয় (মিলিয়ন ডলার)	৩৮২৫৯	৪২৩২৯	৪০৭৭১	৪৫৯৫৯	৪৮৫৯৩

২০১১ সালে ওআইসি সদস্যভুক্ত ১০টি পর্যটনবহুল এবং সর্বোচ্চ পর্যটন আয়ের দেশ হল (ক্রমান্বয়ে): সৌদি আরব, তুরস্ক, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, কুয়েত, কাজাখস্তান, তিউনিশিয়া,

---

২১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।

২২০. <http://www.islamictourism.com/PDFs/Issue%252019/English/8.pdf>

২২১. Editor:Savaş Alpay, international tourism in the oic countries: prospects and challenges, SESRIC Publication Department, Ankara, Turkey-2013, পৃ. ৩৬, ৩৭, ৪২ ও ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

ইরান, জর্ডান এবং মিসর। এসব দেশে মোট ৪৪.২ মিলিয়ন পর্যটকের আগমন ঘটেছে যা আন্ত:ওআইসি পর্যটকের মোট ৮১.৩ শতাংশ এবং এসব দেশ মোট আয় করেছে ৩৯.৫ বিলিয়ন ডলার যা আন্ত:ওআইসি পর্যটন আয়ের ৮১ শতাংশ।[২২২]

❖ ইসলামি রাজধানী ও নগর সংস্থা (OICC)

১৯৭৮ সালে সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত ৯ম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে ইসলামি রাজধানী ও নগর সংস্থা (Organization of Islamic Capitals and Cities-OICC) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী বছরে ফেজ শহরে অনুষ্ঠিত ১০ম সম্মেলনে ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সংস্থাটির বিধিমালা অনুমোদন করে। এর সদর দফতর মক্কা নগরীতে হলেও সাধারণ সচিবালয় কার্যক্রম পরিচালনা করে জেদ্দা থেকে। ইসলামি রাজধানী ও নগরসমূহের পরিচিতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং ইসলামি রাজধানী ও নগরগুলোর জন্য সামগ্রিক এবং আধুনিক নগর ব্যবস্থা, পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়নে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামি নগরসমূহের সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত, নাগরিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার সার্বিক উন্নয়ন এই সংস্থার মূল লক্ষ্য।[২২৩]

---

[২২২]. Preserving the Identity and legacy of Islamic cities;Islamic architectural heritage in design, style and town planning;islamic legal points regarding land, building and town planning. বিস্তারিত: Inamullah Khan, ibid, P. 755.

[২২৩]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

মুসলিম বিশ্বে শিক্ষা বিস্তারে ওআইসি এর ভূমিকা

উমাইয়া এবং আব্বাসীয় যুগে আরব বিশ্ব জ্ঞান বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষতা সাধন করেছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। বিশেষ করে আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন মুসলিম বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় (চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থ, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূগোল ইত্যাদি) তাদের অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাদের লেখনীগুলো আজো পশ্চিমাবিশ্বে গুরুত্বের সহিত পড়ানো হচ্ছে। এছাড়া তৎকালীন মুসলমানদের সংস্কৃতিও ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের। মক্কা, মদিনা, দামেস্ক, বাগদাদ, কর্ডোভা কেন্দ্রিক যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তৎকালীন পশ্চিমা বিশ্বে তা ছিল বিরল। কিন্তু কালক্রমে হারিয়ে গেছে মুসলমানদের সে সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা। তাই মুসলিম বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ওআইসি মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণ এবং বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তিতে উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সংস্থাটি বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে।

❖ ইসলামি ইতিহাস, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্র (IRCICA)

১৯৭৬ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ৭ম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে তুরস্ক ইসলামি ইতিহাস, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে ডাকারে অনুষ্ঠিত ৯ম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৯ সালে ওআইসির প্রথম সংস্কৃতি বিষয়ক অঙ্গসংগঠন হিসেবে ইসলামি ইতিহাস, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্র (Research Centre for Islamic History, Art and Culture- IRCICA) যাত্রা শুরু করে। ইস্তাম্বুলে সদর দফতরবিশিষ্ট গবেষণা কেন্দ্রটি সদস্য দেশগুলোর পারস্পরিক এবং সদস্য দেশগুলোর সাথে বহির্বিশ্বের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের উন্নয়নের লক্ষ্যে কেন্দ্রটি দীর্ঘমেয়াদি এবং অভিনব সব কার্যক্রম ও

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। ইসলামি সংস্কৃতির মৌলিক উৎস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদি গবেষণার ফসল হিসেবে পবিত্র কোরআন শরীফের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ ও ইসলামে বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ করে এই কেন্দ্র।[২২৪]

এছাড়া ইসলামি সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎসাহমূলক অনুষ্ঠান যেমন প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং এসব ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করা। উদাহরণস্বরুপ কেন্দ্রটির স্থাপত্যকলা বিষয়ক প্রতিযোগিতার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়-[২২৫]

- ডিজাইন ও গবেষণার জন্য বাদশাহ ফাহাদ পুরস্কার-১৯৮৬ (King Fahd Award for Design and Research -1986);
- ইসলামি ঐতিহ্যের ওপর ফটোগ্রাফী প্রতিযোগিতা-১৯৮৬ (Photography Competition on Islamic Heritage-1986) এবং
- ইসলামি স্থাপত্যের ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য প্রিন্স ফয়সাল পুরস্কার-২০০৮ (Prince Faisal Award for Preservation of Islamic Architectural Heritage-2008)।

কেন্দ্রটি সদস্য দেশ ও মুসলিম অধ্যুষিত অসদস্য দেশের সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকে এবং এসকল সদস্য ও অসদস্য মুসলিম অধ্যুষিত দেশের সাংস্কৃতিক সংহতি দৃঢ়করণে সহায়তা করে থাকে।

বিশ্বের বিভিন্ন আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানীতে সভা অনুষ্ঠান এবং ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং ইসলামি সভ্যতা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকাশনা IRCICA এর স্থায়ী কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এ পর্যন্ত IRCICA এ ধরণের ১২২টির বেশী বই এবং ৬০টিরও বেশী শিক্ষা বিষয়ক সভা-সেমিনারের আয়োজন করেছে।[২২৬] এছাড়া স্থাপত্যকলা বিষয়ক দশশালা পরিকল্পনার অধীনে ইস্তাম্বুল, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ও আল কুদসে IRCICA কতৃক আয়োজিত স্থপতি সম্মেলন সমূহের কথা উল্লেখ করা যায় যা বহুপাক্ষিক সাংস্কৃতিক পরিবেশে ইসলামি ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও প্রসারের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কেন্দ্রে আরও রয়েছে ইসলামি সভ্যতা ও ঐতিহ্যের ওপর এক বিশাল পাঠাগার যাতে ১৪০ এরও অধিক ভাষার ৬০ হাজারের মত বই স্থান পেয়েছে। এতে ইসলামি সভ্যতার অত্যন্ত দুর্লভ, প্রাচীন ও মূল্যবান দলিল দস্তাবেজ, মানচিত্র ইত্যাদি স্থান

---

২২৪. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

২২৫. The OIC Journal (Issued by OIC), May-August 2009, Jeddah, Saudi Arab, P. 55.

২২৬. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছে। উল্লেখ্য যে গবেষণামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে IRCICA কেবল সদস্য দেশগুলোর মাঝেই নিজস্ব বিচরণ সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিজস্ব কার্যক্রমের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে ওআইসির সম্পর্কোন্নয়ন ও এর অবস্থান সংহত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

❖ আন্তর্জাতিক ইসলামি ফিক্‌হ অ্যাকাডেমি (IIFA)

১৯৮১ সালে মক্কা ও তায়েফে অনুষ্ঠিত ৩য় শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে ইসলামি ফিক্‌হ অ্যাকাডেমি এর প্রতিষ্ঠা। পরবর্তীতে এটি আন্তর্জাতিক ইসলামি ফিক্‌হ অ্যাকাডেমী (International Islami Fiqh Academy- IIFA) নাম গ্রহণ করে। এর সদর দফতর সৌদি আরবের জেদ্দায়। ইসলামি আইনবিদ, ফিকহ বিশেষজ্ঞ এবং পন্ডিতগণ এই অ্যাকাডেমির সদস্য। নির্ভরযোগ্য তথ্যের আলোকে ইসলামি ফিক্‌হ সংক্রান্ত বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক দুরত্ব কমিয়ে আনা এবং মুসলিম জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যার বাস্তবভিত্তিক সমাধান ও দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে ইসলামি আইনভিত্তিক গবেষণা চালনা এবং মতামত প্রদান এই অ্যাকাডেমির মূল লক্ষ্য।[২২৭]

এছাড়াও এর বিধিমালা, যা ১৯৮২ সালে নিয়ামেতে অনুষ্ঠিত ১৩তম ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত হয়, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিহ্নিত করে:[২২৮]

১. ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক আচরণ ও ইসলামি শরিয়া অনুসরণের মাধ্যমে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিকভাবে ইসলামি ঐক্য অর্জন করা।

২. ইসলামি দেশগুলোকে তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করা এবং সমস্যা ও সঙ্কট মোকাবেলায় ও আইন প্রণয়নে ইসলামি শরীয়ার সহায়তা নেয়া।

ওআইসির সংস্কার প্রক্রিয়ার আওতায় মক্কায় বিশেষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্বে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পন্ডিতদের সভায় ঠিক করা হয় যে, ফিকহ অ্যাকাডেমিকেও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে, যাতে করে এটি মুসলিম বিশ্বের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এবং ইসলামাতঙ্ক ও ইসলামের প্রতি অপবাদমূলক বিষয়গুলোকে যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সাধারণ সচিবালয়ের প্রথম কাজ ছিল, দশশালা পরিকল্পনা অনুযায়ী অ্যাকাডেমির সংবিধিগুলো পুনর্বিবেচনা করা। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ সচিবালয় একটি আইনজীবি দলকে আমন্ত্রণ জানায় যারা ইসলামের বিভিন্ন ধর্মীয় ও আইনগত শাখার প্রতিনিধিত্ব করে। এই দলের মূল লক্ষ্য ছিল অ্যাকাডেমির ফতোয়াগুলোকে সমন্বিত করা, ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রতিহত করা,

---

[২২৭].Inamullah Khan, ibid, P. 763.

[২২৮]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম মতধারার বিভিন্ন শাখার ওপর আনীত অপবাদের মোকাবেলা করা এবং সংযম ও সহনশীলতার বাণী প্রচার করা। এই দল মুসলিম উম্মাহর সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সঙ্কটগুলো নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে। তারা মতপ্রকাশ করে, এই সঙ্কটগুলো মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং মুসলিম বিশ্বে বিশ্বাসযোগ্যতা ও সম্মান অর্জন করতে হলে সংস্কারের মাধ্যমে অ্যাকাডেমির মর্যাদা ও অবস্থান আরও দৃঢ় করতে হবে। তারা অ্যাকাডেমিকে মুসলিম দেশগুলো থেকে সরকার নির্বাচিত ইসলামি ও বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান করতে পারে এমন পন্ডিতবর্গ ও বিদ্বানদের সমন্বয়ে একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়ার প্রস্তাব দেন। এ লক্ষ্যে দু'জন প্রখ্যাত পন্ডিত ড. সেলিম আল আওয়া[২২৯] এবং শেখ বেল খোজা অ্যাকাডেমির নতুন বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করেন। এই খসড়াটি পরবর্তীতে আইনজ্ঞদের দ্বারা বিবেচিত ও সমর্থিত হয় ও সদস্য রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক স্থাপিত একটি উন্মুক্ত কার্যকরী দলের কাছে উপস্থাপন করা হয়। ২০০৬ সালের জুনে বাকুতে অনুষ্ঠিত ৩৩তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে বিধিমালাটি গৃহীত হয়।

নতুন বিধিমালা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ফিকহ অ্যাকাডেমি নতুন নাম নিয়ে কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা লাভ করে। এ লক্ষ্যগুলো হল[২৩০]-

১. মুসলমানদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সমতা সাধন;

২. সমসাময়িক ইস্যু ও সমস্যাগুলোর গঠনমূলক ব্যাখ্যা প্রদান;

৩. ধর্মীয় অনুশাসন প্রদানকারী বিভিন্ন কতৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা, যার মূল উদ্দেশ্য হবে ফতোয়া নিয়ন্ত্রণ করা;

৪. ফ্যাসিবাদী মতবাদ, ধর্মীয় উগ্রবাদ, মুসলিম শাখাগুলোর সংকীর্ণ মনোভাব ও মতবাদ মোকাবেলা করা;

৫. ইসলামি ধারার বিপরীতে যে কোনো ধর্মীয় অনুশাসনের বিরোধীতা করা;

৬ .দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের ইসলামী ব্যাখ্যা প্রদান করা;

৭ .ইসলামি আইনগত দর্শনে আগ্রহ সৃষ্টি করা;

৮. ফিকহের গঠনমূলক উন্নয়নের জন্য ও মুসলিম উম্মাহ যেসব সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে সরাসরি প্রতিক্রিয়া প্রদান করা;

৯. ইসলামি দেশের বাইরে অবস্থিত মুসলিম সম্প্রদায়গুলোকে সাহায্য করার জন্য ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;

---

২২৯. জন্ম-২২ ডিসেম্বর ১৯৪২, আলেকজান্দ্রিয়া,মিসর। প্রখ্যাত মিসরীয় লেখক ও ইসলামিক চিন্তাবিদ। তিনি লন্ডনভিত্তিক International Union for Muslim Scholar-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বিস্তারিত: <http://en.m.wikipedia.org/wiki/Mohammad_salim_Al-Awa>.

২৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

Dhaka University Institutional Repository

১০.বিভিন্ন ইসলামি শাখার মতপার্থক্য সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা করা;

১১. জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরিয়া আইনের অবস্থান ব্যাখ্যা করা;

১২. ইসলামি আইনগত দর্শন নবায়ন করা ।

❖ ইসলামি বিশ্ব বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি (IAS)

ওআইসির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সুপারিশক্রমে ইসলামি বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি (Islamic Academy of Science) হিসেবে ১৯৮৬ সালে ইসলামি বিশ্ব বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি (Islamic World Academy of Sciences-IAS) প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৩১] জর্ডানের আম্মানে সদর দফতর বিশিষ্ট অ্যাকাডেমিটি ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশসমূহকে তথ্যপ্রযুক্তি, জৈবপ্রযুক্তি ও ন্যানো টেকনোলজি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এছাড়া বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান বিষয়ক বই,[২৩২] দ্বান্মাসিক নিউজলেটার এবং ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান বিষয়াবলি সম্বলিত জার্নাল[২৩৩] প্রকাশ করে থাকে। এর মূল লক্ষ্য হল-[২৩৪]

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা;
- ইসলামী তথা মুসলিম বিশ্বের সমস্যাবলি সম্বলিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণায় উৎসাহিত করা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করা।[২৩৫] ২০১৩ সালে এ পুরস্কার লাভ করেন "বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস"-এর উপাচার্য অধ্যাপক লিয়াকত আলী।[২৩৬]

৬-৮ মে ২০১৩ IAS-এর ১৯তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। এতে মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৮ দফা বিশিষ্ট ঢাকা ঘোষণা প্রকাশ করা হয়।[২৩৭]

---

২৩১. The OIC Journal (Issued by OIC), May-August 2009, Jeddah, Saudi Arab, P. 76.

২৩২. যেমন-Islamic Thought and Modern Science-1998, Quranic Concept and Scientific Theories-1999, Islamic World Academy of Science Outreach, Intellectual property Rights: An Introduction for Scientists and Technologists etc. আরো দেখুন-www.iasworld.org/books/

২৩৩. যেমন-Medical Journal, Isalm`s Response to Science`s Big Questions, Muslim Science, From Science to Science Policy. www.iasworld.org

২৩৪. The OIC Journal (Issued by OIC), May-August 2009, Jeddah, Saudi Arab, P. 76.

২৩৫. ইবরাহীম স্মৃতি অ্যাওয়ার্ড, IAS-এর প্রতিষ্ঠাতা ফেলো, মরহুম প্রফেসর মোহাম্মদ ইবরাহীমের নামে প্রবর্তিত এ পুরস্কারটি প্রতি দু বছর পর পর মুসলিম বিশ্বের একজন বিজ্ঞানীকে দেওয়া হয়। আরো দেখুন-www.iasworld.org/awards/

236. দৈনিক প্রথম আলো, ০৯/০৫/২০১৩, বৃহস্পতিবার, পৃ- ১৭.

Dhaka University Institutional Repository

❖ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়ন বিষয়ক ইসলামি ফাউন্ডেশন (IFSTAD)

১৯৭৫ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়ন বিষয়ক ইসলামি ফাউন্ডেশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওআইসির জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা, পরামর্শ প্রদান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহযোগিতার প্রসার ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উন্নয়ন বিষয়ক ইসলামি ফাউন্ডেশন (Islamic Foundation for Science, Technology and Development-IFSTAD) এর অগ্রযাত্রা। ১৯৮৩ সালে কার্যক্রম শুরু করলেও IFSTAD প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত COMSTECH এর সাধারণ সভায় IFSTAD বিলোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৩৮]

❖ ইসলামি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন (ICPICH)

১৯৮২ সালে নিয়ামেতে অনুষ্ঠিত ১৩তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে ইসলামি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন (International Commission for the Preservation of Islamic Cultural Heritage-ICPICH) বিধিমালা গৃহীত হয়। ইসলামি ইতিহাস, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্র (IRCICA) সংগঠনটির সচিবালয় ও নির্বাহী অঙ্গ হিসেবে কাজ করত। IRCICA-এর মহাপরিচালক একই সাথে ICPICH-এর সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতেন। সদস্য দেশ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ১৩ জন পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ICPICH এর সদস্য ছিলেন। এর মধ্যে IRCICA এর গভর্নিং বোর্ডের ৯ জন সদস্য পদাধিকার বলে ICPICH এর সদস্য পদ অধিকার করেন। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত কমিশন চারবার বৈঠক করে। পরবর্তীতে কমিশনের সভাপতির মৃত্যুর পর এবং ২০০০ সালে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত ২৭তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ICPICH কে IRCICA এর সাথে একীভূত করা হয়। ICPICH এর কার্যক্রম IRCICA এর কার্যক্রম

---

[২৩৭].Encourage public understanding and awareness of science highlighting, in the process, gender equality, social inclusion and participation; Organise programmes on leadership training for both domestic and regional research and innovation policy makers; Evaluate the quality of statistical data on STI and the statistical system on research and development, as a prerequisite to developing sound and effective strategy in STI etc. <http://www.iasworld.org/wp-content/uploads/2013/10/Dhaka-Declaration-2013.pdf>.

[২৩৮]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। ICPICH এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, যা পরবর্তীতে IRCICA কর্তৃক পরিচালিত হয়, হচ্ছে-

- ত্রিবার্ষিক ক্যালিগ্রাফি প্রতিযোগিতা;
- ইসলামি স্থাপত্য ও কারুকার্য সংক্রান্ত গবেষণা বিষয়ক বাদশাহ ফাহাদ পুরস্কার প্রতিযোগিতা (১৯৮৬) এবং
- ইসলামি ঐতিহ্য বর্ষ (১৯৮৬) উপলক্ষে আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা।[২৩৯]

❖ ইসলামি শিক্ষা বিষয়ক বিশ্বকেন্দ্র

১৯৭৯ সালে ফেজে অনুষ্ঠিত ১০ম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে সাধারণ সচিবালয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি ইসলামি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করে। সম্মেলনে মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পবিত্র মক্কা নগরীভিত্তিক ইসলামি শিক্ষা বিষয়ক বিশ্বকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৮২ সালে সৌদি আরব কেন্দ্রটিকে মক্কাস্থ উম আল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করে এবং এর কার্যক্রমের ব্যয়ভার বহনের ঘোষণা দেয়। একই বছর নিয়ামেতে অনুষ্ঠিত ১৩তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে সৌদি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং কেন্দ্রটিকে ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে অন্যান্য ওআইসি অঙ্গসংগঠনসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষার আহবান জানানো হয়। পরবর্তীতে কেন্দ্রটি নাম পরিবর্তন করে "ইসলামি শিক্ষা বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্র" নাম ধারণ করে এবং "ইসলামি ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান" এর সাথে সংযুক্ত হয়।[২৪০]

❖ ইসলামি শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ISESCO)

১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত ১০ম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের মাধ্যমে ইসলামি শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization-ISESCO) প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও ১৯৮১ সালে মক্কা ও তায়েফে অনুষ্ঠিত তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে এটি অনুমোদন লাভ করে।। ওআইসির শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক কার্যক্রমে সহায়তা ও পূর্ণতা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা। এর সদর দফতর মরক্কোর রাবাতে। সদস্য দেশসমূহের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা এবং উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা ISESCO-এর প্রধান লক্ষ্য। সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সদস্য দেশসমূহের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা করার পাশাপাশি ইসলাম ও মুসলিম জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত বিভিন্ন মিথ্যা ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি দূর করার লক্ষ্যে গৃহীত ওআইসির বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিপূরক শক্তি হিসেবে

---

২৩৯. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।

২৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থাটি তার নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া সংস্থাটি সদস্য দেশগুলোর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা প্রদান করে থাকে।[২৪১] বিজ্ঞান ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান ISESCO-এর ত্রিবার্ষিক পরিকল্পনা ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতাভুক্ত।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ইসলামি শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম-[২৪২]

- ২৫৬০টি প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা, বিশেষায়িত সভা-সেমিনার, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন; যেখানে ইসলামিক ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান বিদ্বান ও পন্ডিতবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।
- আরবি, ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় রচিত ৬৯৮টি প্রকাশনা। এছাড়া সংস্থাটি ৮০টি ইস্যুতে "ISESCO Newsletter" এবং স্পেনিশ, রাশিয়ান ও ফারসি ভাষায় কিছু অনুবাদ গ্রন্থও প্রকাশ করে থাকে।
- সদস্য দেশসহ অসদস্য মুসলিম সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষায় সহায়তার লক্ষ্যে সংস্থাটি বিভিন্ন বিষয়ে ২৮৫০টি বৃত্তি প্রদান করে।

❖ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নবধারা সংস্থা (STIO)

২০০৭ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ৩৪তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নবধারা সংস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও এটি কার্যকর হয় ২০১০ সালে রিয়াদে অনুষ্ঠিত এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যদেশের সনদ অনুমোদনের মাধ্যমে। এটি ওআইসিভুক্ত একটি বিশেষায়িত সংস্থা যা ওআইসি সনদ অনুযায়ী শীর্ষ সম্মেলন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে গৃহীত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলো কার্যকর করে থাকে। করাচিভিত্তিক এই সংস্থাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল[২৪৩]-

- সদস্য দেশগুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাদেরকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও নবধারার সমন্বয়ে উৎসাহিত করা;

---

[২৪১]. Strengthening of Co-operation among the Islamic States in the field of education, Culture and Scientific research; Suppoting authentic Islamic Culture and Protection for the independence of Islamic thought; supporting understanding among the people and contributing to world peace and security through various means and especially through education, science and culture. বিস্তারিত: Inamullah Khan, ibid, P. 731.

[২৪২]. The OIC Journal, May-August 2009, Jeddah, Saudi Arab, P. 65.

[২৪৩]. <http:// www.oic_oci.org/sprcialised institutions>.

Dhaka University Institutional Repository

- সদস্য দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সম্ভাবনার সর্বোচ্চ ব্যবহার;
- নব সমস্যা মোকাবেলায় সদস্য দেশের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

এর কার্যক্রম-

- ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন, COMSTECH এর সাধারণ সভা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে এর সদস্য দেশগুলোর STI (Science, Technology and Innovation) বিষয়াবলী নিয়ে গবেষণা করা;
- সদস্য দেশের STI নীতি ও অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করা;
- সদস্য দেশের সুবিধার্থে STI সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সংযুক্ত থাকা;
- বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি বাস্তবায়নে মুসলিম সমাজের মাঝে সচেতনতা তৈরী করা;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা;

❖ বিভিন্ন দেশে স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

• ইসলামি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (IUT)

১৯৭৮ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত ৯ম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের অনুমোদনের মাধ্যমে ইসলামি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (Islamic University of Technology-IUT) এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার ৫৭টি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী ইসলামী আন্তর্জাতিক সংস্থা ওআইসির বিশেষায়িত সংগঠন হিসেবে ২৭ মার্চ ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩০ একর ক্যাম্পাস বিস্তৃত এ বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান ঢাকা থেকে ৩০ কি.মি. উত্তরে গাজীপুরে। প্রতিষ্ঠাকালে এটি ইসলামি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্র (Islamic Centre for Technical, Vocational Training and Research-ICTVTR) নামে অস্তিত্ব লাভ করে। Palestine Liberation Organization (PLO) এর তৎকালীন চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত এবং ওআইসির তৎকালীন মহাসচিব হাবিব চট্টির উপস্থিতিতে ICTVTR-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। ১৪ জুলাই ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৪ সালে মরক্কোতে অনুষ্ঠিত ২২ তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে ICTVTR-এর নামকরণ করা হয় Islamic Institute of Technology (IIT) । পরবর্তীতে ২০০১ সালে বামাকো, মালিতে অনুষ্ঠিত ২৮ তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এটি Islamic University of Technology (IUT)-এ উন্নীত হয়।[২৪৪] এটি মূলত শিক্ষা এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেটি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রকৌশল, কম্পিউটার, তথ্যপ্রযুক্তি এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণমূলক কোর্স প্রদান করে থাকে ।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে- প্রকৌশলী, প্রযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে সদস্য দেশগুলোতে দক্ষ মানব সম্পদের উন্নয়ন সাধন ।[২৪৫] বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে গবেষণা, কারিগরি সহযোগিতা বৃদ্ধি, কারিগরি জ্ঞান আদান-প্রদান, মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রাথমিক তথ্য ও উপাত্তের প্রচার ও প্রসারকল্পে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও প্রকাশনার আয়োজন করে ইসলামী প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি সদস্য দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করে থাকে। সম্পূর্ণ আবাসিক এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ৩০টি দেশের প্রায় ৩০০০ ছাত্র/ছাত্রী অধ্যয়নরত।[২৪৬] এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ৫টি বিভাগের অধীনে পাঠ কার্যক্রম পরিচালিত হয়-[২৪৭]

- কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ (Computer Science and Engineering-CSE)
- ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক প্রকৌশল বিভাগ (Electrical and Electronic Engineering-EEE)
- মেকানিক্যাল ও কেমিক্যাল বিভাগ (Mechanical and Chemical Engineering-MCE)
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিভাগ (Technical and Vocational Education-TVE)
- সিভিল ও পরিবেশগত প্রকৌশল বিভাগ (Civil and Environmental Engineering-CEE)

---

২৪৪. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২ ।

২৪৫. The main objective of the University is to help generally in human resources development in member States of the OIC, particularly in different fields of engineering, technology and technical education. বিস্তারিত: (www.iutoic-dhaka.edu)

২৪৬. The OIC Journal, May-August 2009, Jeddah, Saudi Arab, P. 59.

২৪৭. <http:// www.iutoic-dhaka.edu>

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শক্তি ও পরিবেশ কেন্দ্র (Energy and Environment Centre-EEC) নামে একটি বিশেষায়িত কেন্দ্র রয়েছে যেটি নবায়নযোগ্য শক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ বিপর্যয় এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়টির মেকানিক্যাল ও কেমিক্যাল বিভাগ (Mechanical and Chemical Engineering-MCE) এ Ph.D. প্রোগ্রাম চালু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি নিয়মিত প্রকাশনার অংশ হিসেবে কারিগরি জার্নাল (Journal of Engineering and Technology), দ্বিমাসিক নিউজলেটার এবং বার্ষিক নিউজ বুলেটিন প্রকাশ করে থাকে।[২৪৮]

- নাইজার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ২য় শীর্ষ সম্মেলনে ওআইসির অঙ্গসংগঠন হিসেবে দুটো ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালে ইয়েমেনের সানায় অনুষ্ঠিত ১৫তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে এটি অনুমোদিত হয়। । সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে Islamic University of Niger অফিসিয়ালি Oum Al-Qura University of Niger নামে কার্যক্রম শুরু করে। এটি নাইজারের রাজধানী নিয়ামে থেকে ৩৭ মাইল দূরে ধর্মীয়ভাবে প্রসিদ্ধ শহর 'সে' (Say) তে অবস্থিত।

শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ করে আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামী শরী'আত সহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এতে ৭টি অনুষদের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়–[২৪৯]

১. শরীয়াহ ও ইসলামি শিক্ষা অনুষদ (Faculty of Shariah and Islamic Studies)

২.আরবি ভাষা ও সাহিত্য অনুষদ (Faculty of Arabic Language and Literature)

৩.উচ্চ শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (Institute of Higher Rducation, Pedagogy and Teachers Training)

৪.ইসলামি ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে আফ্রিকান সেন্টার (African Centre for the Revalorization of the Islamic Heritage)

---

[২৪৮]. The OIC Journal, May-August 2009, ibid. P. 59.

[২৪৯]. Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

৫.ইকরা- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (IQRA-Centre for Technical and Vocational Training)

৬.স্নাতকোত্তর শাখা (Section for postgraduate Studies) এবং

৭.ইসলামি শিক্ষা ও আরবি ভাষার মহিলা কলেজ (Women college for Islamic Studies and Arabic Language)

- উগান্ডা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত ২য় শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উগান্ডা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় (Islamic University in Uganda) তার কার্যক্রম শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যই হলো পশ্চিম এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজি ভাষাভাষী মুসলিম সম্প্রদায়কে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। ৪টি ক্যাম্পাসভিত্তিক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস অবস্থিত উগান্ডার রাজধানী কাম্পালা থেকে ২২২ কি.মি. দূরে অবস্থিত মাবেলে (Mbale) শহরে।[২৫০] মাত্র ৮০ জন ছাত্র/ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও জুলাই ২০০৯ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ১৭টি দেশের ৬২০৯ জন ছাত্র/ছাত্রী অধ্যয়নরত।[২৫১] এতে ৯টি অনুষদের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়-

১.আইন অনুষদ (Faculty of Law)

২.বিজ্ঞান অনুষদ (Faculty of Science)

৩.শিক্ষা অনুষদ (Faculty of Education)

৪.ব্যবস্থাপনা শিক্ষা অনুষদ (Faculty of Management Studies)

৫.কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ (Faculty of Arts & Social Science)

৬.ইসলামি শিক্ষা ও আরবি ভাষা অনুষদ (Faculty of Islamic Studies & Arabic Language)

৭.স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুষদ (Faculty of Health Science)

৮.প্রযুক্তি ও প্রকৌশল অনুষদ (প্রস্তাবিত) (Faculty of Technology & Engineering)

৯.স্নাতকোত্তর শিক্ষা কেন্দ্র (Centre for Postgraduate Studies)

---

২৫০. ক্যাম্পাস ৪টি হল: মাবেলে(মূল ক্যাম্পাস), কাবুজ্জা(মহিলা ক্যাম্পাস), কিবুলি এবং আরুয়া।

২৫১. The OIC Journal, May-August 2009, Jeddah, Saudi Arab, P. 59.

Dhaka University Institutional Repository

- মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় (IIUM)

ওআইসির শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে *(To enhance and develop science and technology and encourage research and cooperation among Member States in these fields)*[২৫২] ১৯৮২ সালে নাইজারের নিয়ামেতে অনুষ্ঠিত ১৩তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে মালয়েশিয়া সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মালয়েশিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (International Islamic University in Malaysia-IIUM) প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ২০ মে ১৯৮৩ সালে মালয়েশীয় সরকার এবং ওআইসি সদস্য দেশ ও সাধারণ সচিবালয়ের মাঝে কূটনৈতিক সমঝোতা স্থাপনের মাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয়টি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত।

অক্টোবর ২০১০ সালে মালয়েশীয় সরকার ওআইসির নিকট আবেদন করে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ওআইসি অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি দানের জন্য। বিষয়টি পর্যালোচনার পর ২০১১ সালে কাজাখস্তানের আস্তানায় অনুষ্ঠিত ৩৮তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে এটি অনুমোদন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেসব লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করে-

১.মালয়েশিয়া এবং মুসলিম বিশ্বের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বাস ইমান ও আমলের ভিত্তিতে সচ্চরিত্রবান বিদ্বান/পন্ডিত তৈরী করা;

২.আন্ত:সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা;

৩.ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের মাঝে মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরী করা;

৪.মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের লক্ষ্যে ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের মাধ্যমে ইসলামী নীতি-আদর্শ বাস্তবায়ন করা।[২৫৩]

আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার মাহাথির মোহাম্মদ ২৪ আগস্ট ১৯৯৩ সালে আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ার ১০ম বার্ষিকী পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এক দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এতে তিনি বলেন- ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের অবশ্যই সর্বদিক থেকে পারদর্শী ও জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে এবং তাদেরকে এমনভাবে জীবনযাপন করতে হবে যেন তারা সব ক্ষেত্রে মুসলমানদের জীবন বিধানে

---

[২৫২]. ওআইসি সনদ, অধ্যায়-১, আর্টিকেল-১, ধারা-১৩।

[২৫৩]. <http://www.oic-oci.org/affiliated organization>

Dhaka University Institutional Repository

অবদান রাখতে পারে। নিজেদের এবং মুসলিম উম্মাহকে কিভাবে পরিচালিত করতে হবে, উন্নত করতে হবে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে অবশ্যই ইসলামের রীতিনীতি পালন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।[২৫৪]

- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তালিকাভুক্তকরণ

উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার প্রচার ও প্রশিক্ষণের ভিত্তি তৈরি করার মাধ্যমে মানব সম্পদের গঠন ও উন্নয়ন। এ প্রেক্ষিতে মেধানির্ভর অর্থনীতি এবং বাজারভিত্তিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি সাড়া দেয়ার সুবিধার্থে ওআইসি সদস্য দেশসমূহের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার মান ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে ওআইসি দেশসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান এবং গবেষণা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের অবদান মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়। এই পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে একটি বিশেষ লক্ষ্য অর্জিত হবে। আর এই লক্ষ্য হচ্ছে ওআইসি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে প্রথমত সর্বোত্তম ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে তালিকাভুক্ত করা, পরে এই ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের সেরা ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় উন্নীত করা এবং সবশেষে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ওআইসিভুক্ত সদস্য দেশগুলোর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনুসরণীয় করে গড়ে তোলা।[২৫৫] ২০১৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Islamic World Academy of Science-IAS এর ১৯তম সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে জানানো হয় যে ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশগুলোর ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়[২৫৬] QS World University Rankings 2012/2013 অনুযায়ী বিশ্বের সেরা ৫০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।[২৫৭]

---

২৫৪. মাহাথির মোহাম্মদ (অনুবাদঃ আবু জাফর), ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ, (ঢাকাঃ হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০০৯), পৃ. ১৯৯।

২৫৫. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

২৫৬. যেমনঃ মালয়েশিয়ার- Universiti Malaya (156), Universiti kebangsaan Malaysia (261), Universiti sains Malaysia (326), Universiti Teknologi Malaysia (358), Universiti Putra Malaysia (360)। সৌদি আরবের- King Saud University (197), Jing Fahd University of Petrolium & Minerals (208), King Abdul Aziz University (334)। লেবাননের- American University of Bairut (250)। ইন্দোনেশিয়ার- University of Indonesia (273)। আরব আমিরাতের-United Arab Emirates University (370) ইত্যাদি।

২৫৭. <http://www.iasworld.org/wp-content/uploads/2013/10/dhaka-declaration 2013.pdf>

Dhaka University Institutional Repository

- মুসলিম বিশ্বের আবিষ্কার সংক্রান্ত এটলাস (AIWSI)

ওআইসির সাধারণ সচিবালয় একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক চিত্র পাওয়ার লক্ষ্যে SESRIC এর তত্ত্বাবধানে যুক্তরাজ্যের রয়েল সোসাইটির সহযোগিতায় Atlas of Islamic World Science and Innovation-AIWSI নামে একটি বৃহৎ প্রকল্প হাতে নেয়। অক্টোবর ২০০৩ সালে মালয়েশিয়ার পুত্রজায়ায় অনুষ্ঠিত ১০ম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত ওআইসি ভিশন-১৪৪১ হিজরী এর সুপারিশক্রমে এবং ডিসেম্বর ২০০৫ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত বিশেষ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষিত দশসালা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এর প্রতিষ্ঠা। প্রকল্পটি মার্চ ২০০৮ সালে ডাকারে অনুষ্ঠিত ১১তম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে অনুমোদন লাভ করে।[২৫৮]

বিশ্ব অর্থনীতি আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিত্যনতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গেলে উন্নত প্রযুক্তি অর্জন এবং তার মাধ্যমে একটি মেধানির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই। আর তা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত একটি কার্যকর এবং বাস্তবায়নযোগ্য নীতি প্রণয়ন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, প্রায় ২০টি ওআইসি সদস্য দেশের উপাত্ত নিয়ে দেখা যায় যে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত গবেষণা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে ওআইসি সদস্য দেশসমূহের গড় বিনিয়োগ হচ্ছে শতকরা ০.৩৪ ভাগ এবং সেক্ষেত্রে পুরো বিশ্বের গড় শতকরা ২.৩৬ ভাগ।[২৫৯]

সমন্বিতভাবে এক্ষেত্রে ওআইসির চিত্র খুব সুখকর না হলেও আলাদাভাবে প্রতিটি সদস্য দেশের দিকে লক্ষ্য করলে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়। কাজেই মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনার বিষয়টিকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এক্ষেত্রে বিশেষ করে তেলসমৃদ্ধ সদস্য দেশগুলোর কথা উল্লেখযোগ্য। এইসব দেশ তেলসম্পদ হ্রাস ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে একটি সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী তেল সম্পদোত্তর অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে গবেষণা, উন্নয়নে বিনিয়োগের বিষয়টিকে বেশ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে। এক্ষেত্রে সীমিত আকারে পরিচালিত কিছু পরিসংখ্যানের মাধ্যমে লক্ষ করা যায় যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বে এক নতুন সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে।

তুরস্ক গত ৫ বছরে গবেষণার ক্ষেত্রে তার বিনিয়োগ দ্বিগুণ করেছে। এক্ষেত্রে ওআইসি নির্ধারিত বিনিয়োগ সীমা হচ্ছে জাতীয় আয়ের (জিডিপির) ন্যূনতম শতকরা ১ ভাগ।[২৬০] বিজ্ঞান বিষয়ক

---

২৫৮. <http:// www.aiwsi.org/what is aiwsi>

২৫৯. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

২৬০. The OIC Journal, June-August 2011, ibid, p. 47.

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিশ্ব তালিকায় গত ১২ বছরে তুরস্কের অবস্থান ২৭তম থেকে ১৯তম তে উন্নীত হয়েছে। ২১ জুন ২০১১ সালে American University of Sharjah কর্তৃক আয়োজিত এক সম্মেলনে ওআইসির তৎকালীন মহাসচিব একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু উল্লেখ করেন যে ওআইসির সদস্য দেশসমূহে ২০০০ সালে যেখানে প্রকাশনার সংখ্যা ছিল ১৮৩৯২টি সেখানে ২০০৯ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩৩৪২টি। ২০০৯ সালে তুরস্ক একাই ২৫০০০ এর অধিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনা বের করেছে।[২৬১] একইধারা অনুসরণ করে মিসরও গবেষণা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে বর্ধিত বাজেট বরাদ্দের ঘোষণা করেছে। ডিসেম্বর ২০০৬ সালে মিসরের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক ঘোষণা করেন যে মিসর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দশক উদযাপনের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৭ সালে সৌদি আরব বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা এবং শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে একটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। ২০০৮ সালে কিং আবদুল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির কার্যক্রম শুরু হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস লাইব্রেরির মাধ্যমে আরব বিশ্বের সব ধরনের বিজ্ঞান গবেষণা ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়। একই ধারায় কাতার দোহা শহরের বাইরে প্রায় ২৫০০ একর জমি নিয়ে একটি শিক্ষা শহর তৈরি করে যার মধ্যে বিশ্বের সেরা ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়াও এপ্রিল ২০০৬ সালে দোহায় প্রবাসী আরব বৈজ্ঞানিকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উচ্চমানসম্পন্ন আরব জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করা এবং মেধা পাচারের বিষয়টিকে প্রতিহত করা। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে আরব বংশোদ্ভূত প্রায় ১৮০ জন বৈজ্ঞানিক এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। তারা আরব বিশ্বের গবেষণার সুযোগসমূহ সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যবহারযোগ্য এবং সহজলভ্য সূত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। এ সভায় কাতার ২০১০ পর্যন্ত বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার জন্য ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বরাদ্দ ঘোষণা করে। এছাড়াও কাতার ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি তহবিল গঠন করে যার নাম 'ওয়েল অব নলেজ' (Well of Knowledge) ফান্ড।[২৬২]

ওআইসির সদস্যভুক্ত অন্য দেশসমূহও এক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। পাকিস্তান মেধা পাচার বন্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ওআইসির প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন আইডিবি, ইসলামি ওয়ার্ল্ড অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স এবং আইসেসকো একই বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণা কার্যক্রম চালিয়েছে এবং তার ভিত্তিতে কিছু কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে। ইরানে ১৯৯৫ সালে যেখানে মাত্র

---

[২৬১]. প্রাগুক্ত, (He stated the number of scientific publications in the OIC Member States has more than tripled from 18,391 publications in the year 2000 to 63,342 in 2009, whereby Turkey alone produced more than 25,000 scientific publications in 2009.)

[২৬২]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০-১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

৫০০ বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাপত্র প্রকাশ হত ২০০৭ সালে এসে সে সংখ্যা ৯০০০ ছাড়িয়ে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরান হচ্ছে বিজ্ঞান বিষয়ক বিষয়ক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান দেশ। ২০০৬ সালে নাইজেরিয়া সরকার একটি নতুন গবেষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় কাউন্সিল স্থাপন করে এবং এর মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত গবেষণা এবং শিক্ষাকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি তহবিল গঠন কওে, যার নাম হচ্ছে পেট্রোলিয়াম টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড। ২০০৭ সালের মে মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি তহবিল ঘোষণা করেন, যার মাধ্যমে আরব বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন এবং বৈজ্ঞানিকদেরকে সহায়তা প্রদান করা হবে। ২০১৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Islamic World Academy of Science-IAS এর ১৯তম সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে জানানো হয় যে ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশসমূহে ২০০০ সালে যেখানে মাত্র ২০০০০ আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র প্রকাশ হত ২০১১ সালে এসে সে সংখ্যা ৯০০০০ ছাড়িয়ে গেছে।[২৬৩]

- দ্রুত ফলদায়ক প্রকল্প (EHP)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে ওআইসির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে দ্রুত ফলদায়ক প্রকল্পের (Early Harvest Projects-EHP) ধারণাটি প্রচলিত করা। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ওআইসির সদস্য দেশসমূহের বর্তমান প্রযুক্তিগত সামর্থ্য, দক্ষতা ও সক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলে অগ্রসর পর্যায়ের প্রযুক্তি অর্জন করা। এর লক্ষ্য হচ্ছে উন্নত ওআইসি সদস্য দেশসমূহের সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়নশীল সদস্য দেশসমূহের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করা।[২৬৪] এই প্রকল্প প্রযুক্তিগত সামর্থ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ ও অবদানকে উৎসাহিত করে। এই প্রকল্প বিশেষ করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট, কার্যকরী, বাস্তবায়নযোগ্য, দ্রুত অর্জনযোগ্য এবং আর্থিক দিক থেকে সাশ্রয়ী প্রকল্পসমূহকে চিহ্নিত করে।[২৬৫]

- বৃহৎ প্রকল্প

ওআইসি সম্প্রতি বৃহৎ প্রকল্প (Mega Projects) নামে একটি নতুন ধারণা বাস্তবায়নে কার্যরত আছে। যা সাধারণত পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরতার ভিত্তিতে অর্জনযোগ্য। এই ধারণাটি মূলত উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে কার্যকরী। এর মূল ভিত্তি হচ্ছে ওআইসি সদস্য

---

[২৬৩]. <http://www.iasworld.org/wp-content/uploads/2013/10/Dhaka-Declaration-2013.pdf>

[২৬৪]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

[২৬৫]. The OIC Journal, May-August 2009, P. 33.

Dhaka University Institutional Repository

দেশসমূহের সাধারণ স্বার্থ, যুগ্ম নকশা, যুগ্ম উৎপাদন এবং সাধারণ বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কিছু উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক দ্রব্যাদিকে বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করা।[২৬৬] এক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই বৃহৎ প্রকল্পের অধীনে ৪টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন-[২৬৭]

১. যুগ্ম নকশা, যুগ্ম উৎপাদন এবং সাধারণ বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোটরগাড়ি তৈরির কার্যক্রম;
২. যুগ্ম নকশা, যুগ্ম উৎপাদন এবং সাধারণ বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উড়োজাহাজ তৈরির কার্যক্রম;
৩. যুগ্ম নকশা, যুগ্ম উৎপাদন এবং সাধারণ বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়োফার্মাসিউটিক্যাল বিভাগ কর্তৃক ঔষধ ও ভ্যাক্সিন উৎপাদন;
৪. যুগ্ম নকশা, যুগ্ম উৎপাদন এবং সাধারণ বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ।

এইসব প্রকল্পের মাধ্যমে সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে ওআইসি সদস্য দেশসমূহের বর্তমান বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা সম্ভব। এর মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দক্ষ জনশক্তিকে একত্রিত করা সম্ভব। এর ফলে আন্ত:বাণিজ্য সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান, দক্ষতার আদান-প্রদান, বিজ্ঞান ও গবেষণার সমন্বয় সাধন এবং উন্নয়নের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের শিক্ষাক্ষেত্রে পরিসংখ্যান[২৬৮]

- বয়স্ক স্বাক্ষরতার হার:

দেশ	মোট	বয়স্ক নারী	বয়স্ক পুরুষ
ওআইসিভুক্ত সদস্য দেশ	৭২.৩	৬৫.৬	৭৮.৮
উন্নত দেশ	৯৮.১	৯৭.৫	৯৮.৭
অ-ওআইসিভুক্ত উন্নয়নশীল দেশ	৮৪.৫	৮০.০	৮৯.২
সমগ্র বিশ্ব	৮২.০	৭৭.২	৮৭.০

[২৬৬]. একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

[২৬৭]. The OIC Journal, May-August 2009, P. 33.

[২৬৮]. Editor: Savaş Alpay, Education and Scientific development in oic countries, SESRIC Publication Department-2014, Ankara, Turkey.

Dhaka University Institutional Repository

- যুবক স্বাক্ষরতার হার:

দেশ	মোট	যুবতী নারী	যুবক পুরুষ
ওআইসিভুক্ত সদস্য দেশ	৮২.০	৭৮.৫	৮৫.৬
উন্নত দেশ	৯৯.৭	৯৯.৭	৯৯.৭
অ-ওআইসিভুক্ত উন্নয়নশীল দেশ	৯০.৯	৮৪.৪	৯৩.৫
সমগ্র বিশ্ব	৮৮.৬	৮৫.৫	৯১.৪

- শিক্ষাখাতে সরকারি ব্যয় (জিডিপির শতাংশ):

দেশ	২০০২	২০১২
ওআইসিভুক্ত সদস্য দেশ	৪.৭	৩.৮
অ-ওআইসিভুক্ত উন্নয়নশীল দেশ	৪.৩	৪.৮
উন্নত দেশ	৫.০	৫.২
সমগ্র বিশ্ব	৪.৯	৫.১

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক তুলনা:

দেশ	২০০২	২০১২
ওআইসিভুক্ত দেশ	৩২	২৮
অ-ওআইসিভুক্ত উন্নয়নশীল দেশ	২৮	২৬
উন্নত দেশ	১৬	১৩
সমগ্র বিশ্ব	২৭	২৪

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক তুলনা:

দেশ	২০০২	২০১২
ওআইসিভুক্ত দেশ	১৯	২০
অ-ওআইসিভুক্ত উন্নয়নশীল দেশ	১৯	২০
উন্নত দেশ	১২	১১
সমগ্র বিশ্ব	১৮	১৮

Dhaka University Institutional Repository

- বৈশ্বিক প্রকাশিত আর্টিকেল:

দেশ	২০০০	২০১৩
ওআইসিভুক্ত দেশ	৩.২	৬.১
অ-ওআইসিভুক্ত উন্নয়নশীল দেশ	১১.৫	১৩.৫
চীন	৩.২	১২.০
যুক্তরাষ্ট্র	২৭.৬	২০.০
যুক্তরাজ্য	৮.৪	৬.৪
জাপান	৭.৯	৪.৩
জার্মানী	৭.২	৫.৪
অন্যান্য উন্নত দেশ	৩২.০	৩২.৪

- ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের ২০১৩ সালে প্রকাশিত আর্টিকেলের সংখ্যা:

দেশ	সংখ্যা	দেশ	সংখ্য	দেশ	সংখ্যা
তুরস্ক	২৫৯৮৬	ইরাক	৭৬২	বাহরাইন	১৫৬
ইরান	২৫৫২৭	কুয়েত	৬৭৬	সুদান	১৫০
মালয়েশিয়া	৯১৫৬	ক্যামেরুন	৬৭৬	আলবেনিয়া	১৪৯
সৌদি আরব	৮৯২২	উগান্ডা	৫৪৭	মোজাম্বিক	১৪৯
মিসর	৭৭৭৮	কাজাখস্তান	৫৩৯	মালি	১৪৫
পাকিস্তান	৬৩৮৬	ওমান	৫২৩	ফিলিস্তিন	১২৭
তিউনিশিয়া	২৯২১	আজারবাইজান	৪৭৩	নাইজার	১১৮
আলজেরিয়া	২০৭৫	সেনেগাল	৩৭৭	গ্যাবন	১১০
লেবানন	১৬৪৯	বেনিন	৩৬০	গাম্বিয়া	১০৯
মরক্কো	১৫৯৫	উজবেকিস্তান	৩১৯	কিরগিজিস্তান	৯৭
ইন্দোনেশিয়া	১৫৪৯	সিরিয়া	৩০১	তাজিকিস্তান	৭২
জর্ডান	১৫৩২	বুরকিনা ফাসো	২৬১	টোগো	৬৬
আরব আমিরাত	১৪৪১	আইভরিকোস্ট	১৯৯	ব্রুনাই	৫৮
বাংলাদেশ	১৩৬৬	ইয়েমেন	১৮৩		
কাতার	৮৯৩	লিবিয়া	১৭২		

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

একুশ শতকে ওআইসি এর সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা এবং এর কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে করণীয়।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে। বৈশ্বিক উষ্ণতা আজ বিশ্ব পরিবেশের বিপর্যয়, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্তি এবং আবহাওয়ার বিপুল পরিবর্তনের জন্য দায়ী। খাদ্য সঙ্কট মোকাবেলায় ও জনগণের মুখে খাদ্য যোগাতে বহু ওআইসি সদস্য দেশের এখন প্রয়োজন নতুন প্রযুক্তি। অন্যদিকে দ্রুতহারে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি সম্পদের হ্রাসপ্রাপ্তি নিয়েও সমগ্র বিশ্ব আজ চিন্তিত। দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামোভুক্ত বহু ওআইসি সদস্য দেশের জন্য এখন ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি উৎস প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। এক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য এবং বিকল্প জ্বালানি উৎস খুঁজে বের করাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। উন্নয়নের যে চালিকাশক্তি উন্নত বিশ্বে বর্তমান সেগুলো এখনও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনুপস্থিত। বহু ওআইসি সদস্য দেশে এখনও শিক্ষা, চিকিৎসা, নাগরিক সুবিধা এবং অরকাঠামোগত সুবিধা অনুপস্থিত। তার ওপরে এসব দেশগুলোকে প্রায়ই বিভিন্ন বিপর্যয় মোকাবেলা করতে হয়। যে সীমিত সম্পদ তাদের রয়েছে তা দিয়ে অন্যান্য সব সমস্যা মোকাবেলার পর বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার মত আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। অথচ উন্নয়নের জন্য এই ক্ষেত্রগুলোতে বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই।

মুসলিম বিশ্ব আজ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে তাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে বিপুল পরিবর্তন ও সমস্যাসমূহের এবং এর ফলাফল হচ্ছে সুদূরপ্রসারী। এখন প্রয়োজন হচ্ছে একটি ভবিষ্যৎমুখী কৌশলগত পরিকল্পনা যা মুসলিম বিশ্বকে নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ও কার্যক্রমের সমন্বয়ের মাধ্যমে শক্তিশালী করবে। এমন একটি পরিকল্পনার মাধ্যমেই কেবল এসব সমস্যা ও পরিবর্তন মোকাবেলা করা সম্ভব। ইতোমধ্যেই ওআইসি দশসালা পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহ এই প্রয়োজনীয় ভবিষ্যৎমুখী দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম হয়েছে।

এই দিকনির্দেশনার মূল বক্তব্য হল ওআইসি সদস্য দেশগুলো নিজেদেরকে একটি সংঘবদ্ধ সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যে সম্প্রদায় জ্ঞানের যথাযথ মূল্য দিতে জানে এবং মুসলিম উম্মাহর উন্নয়নের জন্য আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ উন্নয়ন ও ব্যবহার করতে সক্ষম। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

এবং টেকসই নিয়ামক হচ্ছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন। সুতরাং বর্তমান বিশ্বে নিজস্ব অধিকার ও অবস্থান নিশ্চিত করতে জ্ঞানার্জন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষতা লাভ এবং উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া ব্যতীত মুসলিম বিশ্বের বিকল্প কোনো পথ খোলা নেই।

এইসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ জনসম্পদের উন্নয়ন। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন কৌশল চিহ্নিত করতে হবে। যার মধ্যে রয়েছে দায়বদ্ধতা। ওআইসি সদস্য দেশগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে যে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায় থেকে শুরু করে সরকার এবং ব্যক্তিখাত উভয়কেই মানব সম্পদ এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। এছাড়া ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর আরো প্রয়োজন সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কারকরণ এবং সকল পর্যায়ে শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত করা যাতে করে এর ফলে সৃষ্ট দক্ষ জনশক্তি সমাজের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হতে পারে। আর এর মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং ব্যবসায় ও শিল্প ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এই প্রসঙ্গে নিজস্ব সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে মানব সম্পদই হচ্ছে সর্বোত্তম সম্পদ। সদস্য দেশগুলোর শিল্প কারখানাসমূহে দক্ষ এবং প্রতিভাবান কর্মশক্তির উদ্ভাবন ঘটাতে হবে। এর মাধ্যমে শক্তিশালী প্রতিযোগিতামূলক এক কর্মশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব। একইভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে। যাতে করে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করা যায়। আর এই নেতৃত্ব হবে পরিবর্তনের পথে মূল চালিকাশক্তি।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে উন্নয়নবান্ধব সংস্কৃতি। একটি সমাজ ব্যবস্থা যা জ্ঞান অর্জন এবং শিক্ষা গ্রহণকে সমর্থন করতে এবং যথাযথ মূল্য দিতে জানে তা গড়ে তুলতে হলে আমাদেরকে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের উন্নয়নকে সমর্থন করে, উদ্যোক্তাদের প্রেরণা দেয়, নতুন সব ধারণাকে পুরস্কৃত করে এবং নিত্যনতুন জ্ঞানের ক্ষেত্র আবিষ্কার করাকে উৎসাহিত করে। একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পারস্পরিক সহযোগিতার (Mutual Co-operation) বিষয়টিকেও উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে সুষ্ঠু অংশীদারিত্ব এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে আমাদের বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ, আইনবিদ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, শিল্পকারখানা এবং সরকারি ও ব্যক্তিখাতকে আমাদের মানব সম্পদের দক্ষতা ও প্রতিভা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎসাহিত করা সম্ভব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনযাপন প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করে তোলা যায়। এই সাধারণ তথ্যটি সমাজের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে সাধারণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওআইসিকে কাজ করতে হবে। স্থানীয় চাহিদা পূরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সফলতা এনে দিয়ে জনগণকে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনমুখী করে গড়ে তুলতে হবে। যেহেতু ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর বিনিয়োগ ক্ষমতা ও

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষ জনশক্তির প্রাপ্যতা সীমিত সেহেতু সদস্য দেশের সম্পদকে এমনভাবে বিনিয়োগ করতে হবে যাতে করে সর্বোচ্চ সুবিধাদানে সক্ষম ক্ষেত্রগুলো অগ্রাধিকার পায়।

ওআইসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যে দৃঢ়তা রয়েছে তার মাধ্যমে অনুন্নত এবং সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত সদস্য দেশগুলোকে সহায়তা করার জন্য সংকল্পকে আরও দৃঢ় করতে হবে। সর্বোপরি ওআইসিকে দারিদ্র্যের বিশাল অভিশাপ মোকাবেলা করতে হবে। ওআইসির দশসালা পরিকল্পনা এবং মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলের আওতায় দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়ন যার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সহায়তা ব্যবহার করে দুস্থতা ও দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। এ সহায়তা হতে পারে আর্থিক বা সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক।

ওআইসির আরো একটি লক্ষ্য হতে হবে পরিবেশ উন্নয়ন (Environment Development)। বিশ্ব অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব যার মূল লক্ষ্য হবে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে উন্নয়ন অর্জন। এই সংস্কৃতি মানব সম্প্রদায় কর্তৃক পরিবেশের বিপর্যয় সৃষ্টিকে এড়িয়ে চলতে সহায়তা করবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বজনীন বিধি পদ্ধতিগুলোকে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে যার মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধাসমূহের এবং জ্ঞান ও প্রযুক্তির সুষ্ঠু বন্টন সম্ভব হয়। এ জন্য প্রয়োজন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কিছু সমন্বিত আইন ও মান নির্ধারণী পদ্ধতি। সরশেষে প্রয়োজন এমন একটি দক্ষ অর্থনৈতিক ভিত্তি যা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিশেষ করে উত্তরের উন্নত দেশ এবং দক্ষিণের উন্নয়নশীল দেশগুলোর মাঝে অবারিত জ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রবাহকে নিশ্চিত করবে।

এইসব লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন ব্যবস্থাপনায় একটি পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতে হবে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের ক্রমাগত বিশ্লেষণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ ও ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন বিষয়ক বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এটা করতে গিয়ে ওআইসিকে খুঁজে বের করতে হবে কিছু মুসলিম সমাজ কেন এই ক্ষেত্রে যথাযথ উন্নতি অর্জন করতে পারেনি? এই প্রসঙ্গে ওআইসিকে চেষ্টা করতে হবে যাতে করে সদস্য দেশগুলোর মাঝে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে ব্যবধান রয়েছে তা পারস্পরিক সহায়তা ও সহযোগিতার মাধ্যমে কমিয়ে আনা যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সদস্য দেশসমূহের যে সম্ভাবনা রয়েছে তাকে বাড়িয়ে তুলে ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য তাদেরকে তৈরি করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু নতুন প্রজন্ম ভবিষ্যৎ গঠনে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে সেহেতু তাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব জনশক্তির দক্ষতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধি করার সুযোগ করে দিতে হবে যা সদস্য দেশসমূহের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার পথে এক বিশেষ পদক্ষেপ। এই উদ্যোগের সাথে ব্যক্তিখাত, সক্রিয় সরকার এবং উদ্ভাবনী শিল্পের সমন্বয় ঘটিয়ে ঘুমিয়ে থাকা সৃষ্টিশীল প্রতিভা এবং অব্যবহৃত আর্থিক সম্পদের বিকাশ ঘটাতে হবে। আর এই সবকিছুই করতে হবে ইসলামি মূল্যবোধের ভিত্তিতে।

- সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্রুততা: আন্ত:দেশীয় কোনো সংগঠনের দক্ষতা ও সাফল্য নির্ভর করে স্বল্প সময়ের মাঝে বিভিন্ন জরুরি ইস্যুতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতার ওপর। উল্লেখ্য যে ওআইসির সদস্য দেশগুলোর মাঝে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সবসময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন ও শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে গৃহীত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সংস্থাটি বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে আসছে। যদিও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিশেষ অধিবেশন আয়োজনের ব্যবস্থা রয়েছে তথাপিও বেশিরভাগ সদস্য দেশের জেদ্দায় কোনো স্থায়ী কূটনৈতিক প্রতিনিধি না থাকায় জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি বেশিরভাগ সময়ই দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। আর এ ধরনের জরুরি সময়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য যথাযথ অবকাঠামো না থাকার কারণে নিজস্ব দক্ষতা ও উপযোগিতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়। এ সঙ্কট নিরসনে সদস্য দেশগুলোকে জেদ্দায় তাদের আবাসিক প্রতিনিধি নিযুক্ত করার আবেদন জানানো হলে এবং সৌদি আরব কর্তৃক এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিলেও সামান্য কিছু দেশই এ ব্যাপারে সাড়া প্রদান করেছে। সুতরাং এ সমস্যা সমাধানে ওআইসি মহাসচিব একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু কর্তৃক প্রস্তাবিত 'ত্রয়ী' পদ্ধতির পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে।

- ১৯৮১ সালের কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন: ১৯৮১ সালে তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রণীত হয় কর্মপরিকল্পনা ১৯৮১ যা সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তারপরেও ১৯৮১ সালের কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ধীর গতিতে এগুতে থাকে। এই কর্মপরিকল্পনাটি মূলত তিনটি দুর্বলতায় আক্রান্ত যা এটাকে বাস্তবায়নযোগ্য কোনো কর্মপরিকল্পনা হতে না দিয়ে কেবল কতগুলো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষার সমষ্টিগত ঘোষণাপত্রের রূপ দিয়েছে। এগুলো হল–একটি সময়মত কাঠামোর অনুপস্থিতি, নির্দিষ্ট পরিমাপযোগ্য লক্ষ্যের অভাব এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক কাঠামোর অভাব। এই দুর্বলতাগুলো মোকাবেলা করতে হবে কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমে। যার মাঝে রয়েছে পরিকল্পনাকালীন সময়ে পুরো বাণিজ্যের তুলনায়

Dhaka University Institutional Repository

আন্ত:ওআইসি বাণিজ্য ২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা, অগ্রাধিকারভিত্তিক ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা এবং সময়সীমা নির্ধারণ করা।

- পুনর্গঠন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ: ওআইসির পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শুরু করতে হবে, সমন্বয় সাধন করতে হবে, সমস্যার মূল কারণ এবং অন্যান্য কারণ চিহ্নিত করতে হবে। তার আগে বিদ্যমান কাঠামোর পরিবর্তন করা সমীচীন হবে না।

- চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা: যে বিভিন্ন ও বৈচিত্র্যময় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আজ মুসলিম সমাজ তার মোকাবেলায় যৌথ ইসলামিক উদ্যোগের নতুন ধারণা সূত্রবদ্ধকরণের প্রয়োজন আছে। এর জন্য একটা বিশ্লেষণধর্মী পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে; শুধু শারীরিক কাঠামোই নয়, এর সনদ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলোও এর মাঝে থাকবে।

- দক্ষ জনবল নিয়োগ: ওআইসিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে দক্ষ জনবল নিয়োগ করতে হবে। যারা প্রয়োজনীয় কার্যসম্পাদন করতে সফল এবং যৌথ ইসলামিক উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। পূর্বের নিয়োগদান প্রক্রিয়া যা অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান ও স্বজনপ্রীতি এবং যোগ্যতা অবহেলার দোষে দুষ্ট ছিল তা প্রায়শই কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় কার্যসাধনের ব্যর্থতার মত অসহ্য পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেত। সুতরাং নিয়োগদান পদ্ধতি হতে হবে স্বচ্ছ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে।

- পর্যাপ্ত বাজেটের ব্যবস্থা: অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ওআইসির বাজেট আকারে খুবই কম এবং যার ফলে ওআইসির কাঁধে বেশি দায়িত্ব চাপানো এবং সদস্য দেশগুলোর প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব হয় না। সুতরাং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ওআইসির বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া সংস্থাটির জন্য একটি স্থায়ী ও টেকসই অর্থনৈতিক উৎস গড়ে তুলতে হবে।

- বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায়: সদস্য দেশগুলোর জন্য নির্ধারিত বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

- প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন: ওআইসির সিদ্ধান্তগুলোর রূপরেখা ও বাস্তবায়নের জন্য যে নীতিনির্ধারক সংগঠন রয়েছে তার পুনর্বিবেচনা দরকার। ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রস্তাবনা পাসের পুরো প্রক্রিয়াটিই কষ্টসাধ্য ও প্রায় অবিশ্বাসযোগ্য হয়ে পড়েছে। এর ফলে প্রস্তাবনাগুলোকে গুরুত্বের সাথে নেয়া হয় না এবং তাদের বাস্তবায়ন মাঝে মাঝে সৌজন্যের খাতিরে করা হয়। যার ফলে তাদের প্রভাব সম্মেলন কেন্দ্রের বাইরে যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

- বুদ্ধিজীবীদের সম্মেলন: ওআইসির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিবেচনা করার জন্য প্রতি পাঁচ বছর পর পর মুসলিম পন্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের সম্মেলন আহবান করতে হবে।

- ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা: আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হবে। আর এ লক্ষ্যে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ওআইসি সনদের মূলনীতি ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।

- পশ্চিমা বিশ্ব ও ইসলামি মূল্যবোধের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ: পশ্চিমা বিশ্ব ও ইসলামি মূল্যবোধের মাঝে পার্থক্য নিরূপন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বিবাহের ধারণা এবং পরিবার বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি। এছাড়া সুশাসনের ধারণা মুসলিম বিশ্বের মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। কারণ ইসলামের সুশাসনের ধারণার সাথে পশ্চিমা বিশ্বের গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণার পার্থক্য রয়েছে।

- গণমাধ্যম স্থাপন: মুসলিম বিশ্বের চাহিদা অনুসারে আরও বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ গণমাধ্যম স্থাপন করতে হবে। যার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা সম্ভব।

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে মেধা পশ্চিমা বিশ্ব থেকে উল্টো মুসলিম বিশ্বে আসে। এছাড়া মুসলিম বিশ্বের গবেষণাকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অমুসলিমদের নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

- দরিদ্রবান্ধব নীতিমালা গ্রহণ: ওআইসির সদস্য দেশগুলোর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনধারায় পরিবর্তন আনার জন্য দরিদ্রবান্ধব নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

- মহাসচিবের ক্ষমতা বৃদ্ধি: মহাসচিবকে আরও ক্ষমতা প্রদান করতে হবে যাতে করে তিনি ওআইসির সংস্কারকার্য সম্পাদনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা নিতে পারেন। মহাসচিবের ওপর অঙ্গসংগঠনগুলোর কার্যক্রম সমন্বয়ের ভার ন্যস্ত করতে হবে। মহাসচিবের অবশ্যই বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ মানবাধিকার কমিশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত থাকার ব্যবস্থা সনদে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। সাধারণ সচিবালয়ের সব ধরণের নিয়োগের ক্ষেত্রে মহাসচিবের সর্বময় ক্ষমতা থাকা উচিত তবে তা মন্ত্রী পর্যায়ের সভার পরামর্শক্রমে হতে পারে।

- নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ লাভ: ওআইসির সদস্য দেশগুলো থেকে যে কোনো দেশের জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়া প্রসঙ্গে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

২০০৫ সাল ওআইসির ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। এ বছর প্রথমবারের মত সংস্থাটি একটি অত্যন্ত মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়–যার উত্তরের মাধ্যমে সংস্থার অস্তিত্বে এক নবজাগরণের ছোঁয়া লাগে। সংস্থার প্রথম নির্বাচিত মহাসচিব একমেলেদ্দিন ইহসানোগলুর উদ্যোগে যে কার্যকর সংস্কার প্রক্রিয়া গৃহীত হয় তার অধীনে এই সাধারণ কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নটি সরাসরিভাবে করা হয় এবং সংস্কার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। প্রশ্নটি হচ্ছে: বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে ওআইসির কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কী? সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে তৃতীয় বিশেষ শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতিকল্পে মুসলিম বিশ্বের বাছাইকৃত প্রায় একশ পন্ডিত, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী একত্রিত হয়েছিলেন এক মতবিনিময় সভায়। আর এ সভায় সর্বপ্রথম এ প্রশ্নটি করেন তৎকালীন ওআইসি মহাসচিব একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু। উল্লেখ্য যে ওআইসির ৫৭টি সদস্য দেশের মধ্যে তিনটি আঞ্চলিক দল রয়েছে–আফ্রিকান, আরব এবং এশিয়ান দল। এই তিন দলের অন্তর্ভুক্ত সদস্য দেশগুলো আবার নিজস্ব বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থারও সদস্য। যেমন আফ্রিকান ইউনিয়ন, আসিয়ান, আরব লীগ, এবং উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা। এছাড়া ওআইসির সদস্য দেশগুলো জাতিসংঘেরও সদস্য। কাজেই এই ৫৭টি দেশের এরপরেও কী ওআইসির মত একটি সংস্থার সদস্য হিসেবে থাকার কোনো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর ছিল সর্বসম্মত ও অবিসংবাদিত–হ্যাঁ ওআইসির প্রয়োজন আছে।

মুসলিম উম্মাহর বিশিষ্ট পন্ডিত ব্যক্তিদের সমর্থনের পর এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পরিবর্তনশীল বাস্তবতা ও সময়ের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে ওআইসিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। নতুন শতাব্দীর বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি রেখে সংস্থাটিতে আনতে হবে আরও গতিশীলতা। করতে হবে আধুনিকায়ন, যার ফলে সংস্থা হয়ে উঠবে আরও দক্ষ ও কার্যকর।

২০০৫ সালে শুরুকৃত সংস্কার প্রক্রিয়ার ফলে বর্তমানে ওআইসি তার সদস্য দেশগুলোর সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে সহযোগিতার বিষয়টিকে এগিয়ে নিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ওআইসির সংস্কার প্রক্রিয়া সংস্থাটিকে বর্তমানে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যেখানে মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেদের সদস্য দেশগুলোর সমস্যা সমাধানে ওআইসি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আরও শক্তিশালী ও জোরালো ভূমিকা রাখতে পারছে। এখন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ওআইসিরভুক্ত দেশগুলো অস্থায়ী সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে যে যখন জাতিসংঘের আমূল সংস্কারের বিষয়টি আলোচিত হবে তখন ওআইসি নিরাপত্তা পরিষদে একটি স্থায়ী পদ লাভ করবে। বিশ্বের ১৭৫ কোটি মুসলমানের প্রতিনিধি হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদে

Dhaka University Institutional Repository

ওআইসি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে যা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রাখবে। এছাড়াও জি-২০ গ্রুপে ওআইসির তিনটি দেশের (তুরস্ক, সৌদি আরব ও ইন্দোনেশিয়া) অন্তর্ভুক্তি বিশ্ব মঞ্চে ওআইসির ক্রমবর্ধমান প্রভাবেরই প্রতিফলন। বিশ্ব মঞ্চে আজ মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী কণ্ঠ হিসেবে ওআইসি দৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল থেকে শুরু করে ওআইসি বহির্ভূত বিশ্বের অন্যান্য দেশ এমনকি গ্রুপ ৮ ভুক্ত কিছু দেশের (রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র) মধ্যেও সংস্থাটির সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন বা পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এছাড়া রাশিয়া ওআইসির পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভ করেছে। ২০০৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ওআইসিতে রাষ্ট্রপতির বিশেষ দূতের পদ সৃষ্টি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওআইসির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্রমবর্ধমান উৎসাহের প্রমাণ। ২০১৩ সালে রাশিয়া, চীন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি ও ব্রাজিল বিশেষ দূতের মাধ্যমে ওআইসির সাথে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

সংস্কার প্রক্রিয়ার ফলাফল কেবল বিশ্ব পর্যায়ে নয় বরং মুসলিম বিশ্বের অভ্যন্তরীণ পরিমন্ডলেও অনুভূত হচ্ছে। সদস্য দেশগুলোর কাছেও সংস্থার ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন সনদ ও দশসালা পরিকল্পনার প্রতি সদস্য দেশগুলোর অকুণ্ঠ সমর্থন সংস্থার ওপর তাদের আস্থার প্রতিফলন। ওআইসি গৃহীত নতুন বাণিজ্য ও উন্নয়ন পরিকল্পনা, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য কর্মসূচিতে সদস্য দেশগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ব্যাপক আগ্রহ সংস্থাটির প্রতি তাদের ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার প্রমাণ দেয়।

সদস্য দেশগুলোর সমর্থন নিয়ে ওআইসি সাধারণ সচিবালয় মুসলিম বিশ্বের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে এবং মুসলিম বিশ্বের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে নিজস্ব অবস্থান ও মর্যাদা সংহত করতে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে কাজ করে যাবে। এ লক্ষ্যে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী মুসলিম দেশগুলো এগিয়ে আসতে হবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ বাজেটের ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আল কুরআনুল কারীম

ইয়াহইয়া আরমাজানী, (অনুবাদঃ মুহাম্মদ ইনাম উল হক), মধ্যপ্রাচ্যঃ অতীত ও বর্তমান, (ঢাকাঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন–২০০৬)।

এ বি এম হোসেন, মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসঃ অটোমান সাম্রাজ্য থেকে জাতিসত্তা রাষ্ট্র, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০১৩)।

এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, আল আকসা মসজিদের ইতিকথা, (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯২)।

এম এ কাউসার, মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস, (ঢাকাঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০১২)।

একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু, (অনুবাদঃ মো:আমানুল হক), নব্য শতকে মুসলিম বিশ্বঃ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (১৯৬৯-২০০৯), (ঢাকা:দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড,২০১৩)।

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, আধুনিক মুসলিম বিশ্বঃ তুরস্ক-ইরান-আফগানিস্তান, (ঢাকাঃ নভেল পাবলিশিং হাউস-২০০৬)।

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব, (ঢাকাঃ উত্তরণ, ২০০৪)।

ড. আবদুল ওয়াহিদ, মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, (ঢাকাঃ আরাফাত বুকস এন্ড বুকস, ২০০৬)।

মুহম্মদ আলী আসগর খান, আধুনিক তুরস্কের ইতিহাস (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০০৩)।

মোহাম্মদ রেজাউল করীম, ফিলিস্তিন সমস্যার ক্রমবিবর্তন, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫)।

Dhaka University Institutional Repository

মাহাথির মোহাম্মদ (অনুবাদঃ আবু জাফর), ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ, (ঢাকাঃ হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০০৯)।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিবেদন (Report of the Eminent Persons Group), জেদ্দাঃ ওআইসির অভ্যন্তরীণ অপ্রকাশিত দলিল, ১৯৯৫।

সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত ৩৪ তম স্থায়ী অর্থ কমিটির বৈঠকে তৎকালীন ওআইসি মহাসচিব একমেলেদ্দিন ইহসানোগলু দেয়া ভাষণ (১৩-১৫ মে ২০০৬)

Martin Kramer, Islam Assembled: The Advent of the Muslim Congress, (New York: Columbia University Press, 1986).

A. Sanhoury, The Caliphate, its evolution towards a Society of Eastern nations, (Paris: P. Geuthner, 1926).

Mona F. Hassan, Loss of Caliphate:The Trauma and Aftermath of 1258 and 1924, Ph.D Thesis, (Princeton University, 2009)

Carl Brockelmann, History of the Islamic People, (London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1964).

Saad Khan, Reasserting International: A Focus on the Organization of the Islamic Conference and Other Islamic Institutions, (London: Oxford University Press, 2001).

Mohammad El Sayed Selim (Edited),The OIC in a Changing World, (Cairo University, 1994).

Noor Ahmad Baba, OIC: Theory and Practice of Pan-Islamic Cooperation, (New Delhi: Sterling Publishers, 1994).

Naveed S. Sheikh, The New Politics of Islam: Pan-Islamic Foreign Policy in a World of States, (London: RoutledgeCurzon, 2003)

Dhaka University Institutional Repository

Inamullah Khan (Editor-in-chief), World Muslim Gezetter, (Delhi: International Islamic Publishers, 1992)

Savaş Alpay, international tourism in the oic countries: prospects and challenges, SESRIC Publication Department, Ankara, Turkey-2013

Workshop on Innovative Social Assistance Strategies in Poverty Alleviation 12-14 December 2011 Ankara,Turkey.

Resolution No. 3/33-AF on the New scale of Member States Mandatory Contributions to Annual Budgets of the General Secretariat and its Subsidiary Organs, 2006/07.

Inaugural Statement of Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, Secretary General of the OIC (Jeddah, 28 December 2004)

জার্নাল, পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী

দৈনিক প্রথম আলো, ০৯/০৫/২০১৩

অগ্রপথিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা, ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, ২২ জানুয়ারি ১৯৮৭ সাল।

The OIC Journal, May - August 2009, Jeddah, Saudi Arab

The OIC Journal, June - August 2011, Jeddah, Saudi Arab

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বকোষ ও অভিধান গ্রন্থ

ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, (ঢাকা, ১৯৮৮, খ-৫)

The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, (London: Oxford University press, 1995), V-2.

The Europa World Year Book (London and New York: Routledge Taylor & Francis Group-2013), V-2.

ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৭

ওয়েবসাইট

www.oic-oci.org
www.iutoic-dhaka.edu
www.aiwsi.org
www.people.hofstra.edu/geotrabs/eng/ch3en/conc3en/ch3c4en.html
www.Oicun.org/uploads/files/convention/oic_AGREEMENT_en_1.pdf
www.sesrtcic.org
www.icac.org/cotton_info
www.wto.org
www.islamictourism.com
www.wikipedia.org/wiki/Mohammad_salim_Al-Awa
www.iasworld.org